Quest

An Academic Journal

Quest

An Academic Journal

ULUBERIA COLLEGE
Uluebria, Howrah

Quest

An Academic Journal

Editor :

Dr. Aditi Bhattacharya

Co-ordinating Editor :

Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya

Editorial Board :

Dr. Prabir Pal, Dr. Biswajit Chowdhury,
Sm. Chandana Samanta, Dr. Jayasree Sarkar,
Dr. Chandana Giri, Sri Dipak Nath,
Dr. Momtaj Begam

Quest
An Academic Journal
Vol-4, 2008

Printed by : Charulekha Printer
Uluberia, Howrah
Ph. No. - 26610076

Frontispiece : *Portrait of Socrates*

Courtesy :
Living Biographies of Great Philosophers
By Henry Thomas and Dar Lee Thomas
Garden City Publishing Co. Inc.
New York

"Culture is activity of thought and receptiveness to beauty and human feeling. Scraps of information have nothing to do with it."

–Alfred North Whitehead

Content

Language and Literature :

রবীন্দ্রগানে অভিসারভাবনা	শুভময় ঘোষ	1-5
রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রজীবন ও আমরা	বাসন্তী ভট্টাচার্য	6-11
প্রতিবাদী সাহিত্য : নজরুল ইসলামের কবিতা	চন্দনা সামন্ত	12-16
মুক্তবুদ্ধি রোকেয়া : কন্যা থেকে নারী	ডঃ মমতাজ বেগম	17-23
রাধা	উত্তম পুরকাইত	24-31
ইনফ্যান্ট টেরিবল্	সুপ্রিয় ধর	32-41
বৈদিকযুগে নারীজাতির স্থান	স্বাতী সরকার	42-46

Social Science :

A Journy Into The Dark Cavern Of The Mind	Dr. Aditi Bhattacharya	47-53
Women's Emancipation and Krishnabhabini	Dr. Jayashree Sarkar	54-61
Impact Of Tourism In A Religious Town-Haridwar	Arup Saha	62-66

Science :

Feynman's Approach to Quantum Electrodynamics	Dr. Gautam Kumar Mallik	67-72

Not them, Blame their Chemistry!	Dr. Pratiti Ghosh	73-76
Changing Perspectives in Biodiversity Conservation	Dr. Supatra Sen	77-83
GLOBAL WARMING	Shyamal Kumar Sarkar	84-86
মঙ্গল গ্রহের মেঘে বরফের সন্ধানে - লেসার	গোপেন্দ্র নাথ রায়	87-89

Commerce :

GLOBAL WARMING – A Challenge in the 21st Century	Dipak Kumar Nath	90-101

Library Science :

Open Library : a brief discussion in Indian context	Ms. Sarama Das	102-107

Editorial

We started our journey four years back. We have succeeded in bringing out our academic journal once a year and with T.S. Eliot we can now say, 'we shall not cease from exploration.' Our exploration in different branches of knowledge is going on as is evident by the writings of our faculty members on various interesting topics. We are happy to note that the journal has been appreciated by our colleagues in different colleges. We look forward to the suggestions and comments from our esteemed readers.

We hope that with the co-operation of all cencerned we would be able to continue our endeavour.

Language and Literature

রবীন্দ্রগানে অভিসারভাবনা ঃ

পদাবলীর উত্তরাধিকার ও আধুনিকতার বিস্তার

শুভময় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের চরম উৎকর্ষতা গানে। কোনো বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, তাঁর সৃষ্টিসমুদ্র মন্থন করে যদি কোনো অমৃতভাণ্ড উঠে আসে, তবে সে গানের সুধাপাত্র। তার কণামাত্র প্রসাদে সমস্ত ধূসরতার মাঝে প্রাণ জেগে ওঠে। মনে পড়ে রবীন্দ্রগীতির এই অমৃতস্পর্শের কথা মনে রেখেই এক নারী কবিকে বলেছিলেন — "কবি, তোমার গান শুনলে আমি যেন মরণলোক থেকে উঠে আসতে পারি।" এমনই মৃতসঞ্জিবনী সেই গান। এ-নিবন্ধের বিষয় — "রবীন্দ্রগানে আভিসার ভাবনা ঃ পদাবলীর উত্তরাধিকার ও আধুনিকতার বিস্তার।" অবশ্য এখানে রবীন্দ্রনাথের গান বলতে আমি তাঁর গানের ভাবসম্পদকেই গ্রহণ করেছি, তার সাঙ্গীতিক আলোচনায় আমি অধিকারহীন। আর রবীন্দ্রগানের সেই অমিত বিত্ত থেকে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতা হিসাবেই আমি বেছে নিয়েছি অতি-পরিচিত এবং বহুশ্রুত গানগুলিই। যেখানে এক মগ্নতায় কবিসত্তা আর তাঁর 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'র অভিসার ধরা পড়েছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। সেইসব গানে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের 'অভিসার'-এর উত্তরাধিকার ও আধুনিকতার সূত্রসন্ধানই আমার অন্বিষ্ট।

ভক্তি আর প্রেমের আবেগে জড়ানো রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট প্রেমচৈতন্য প্রকাশ পেয়েছে এ-সব গানে — কিভাবে কবি অর্জন করলেন তা — সেই প্রশ্নের উত্তরে কতগুলি বহুচর্চিত কথা মনে আসে। জন্মসূত্রেই একধরনের ভক্তির পরিমণ্ডল পেয়েছিলেন তিনি। কেননা, তাঁর জন্ম বৈষ্ণব গৃহস্থ বংশে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের অন্তরেও বেশ ভক্তিরস ছিল। রামমোহনের নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম-উপাসনায় দেবেন্দ্রনাথ আবেগঋদ্ধভক্তি অনুভবের স্পর্শ এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উত্তরাধিকারটুকু ছাড়া প্রেমভক্তির জগতে বাকিটুকু তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জন। সদাহাস্যময় ভক্তপ্রাণ শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রশ্রয়, তাঁর কাছে শেখা গান — "ময় ছোড়ো ব্রজকি বাসরী", অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহচর্য, নতুন বৌঠানের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা এবং পরে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কঠিন আঘাত — এ-সবই একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল তাঁর বিশিষ্ট প্রেম ও অধ্যাত্মচেতনাকে। রাধা যেমন বাঁশির সুর শুনেই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কবিও তেমনি ছন্দের টানেই বৈষ্ণব কাব্যের বিশ্বে প্রবেশ করেছিলেন। দশ-এগার বছর বয়সে বাবার বোটের এক কামরার দেরাজ থেকে এভাবেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ'।

কবির নিজের কথায় —"জয়দেব সম্পূর্ণত বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায়, তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম"। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে তিনি পেয়েছিলেন বিদ্যাপতির পদাবলী। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে ইংরেজ কিশোর কবি চ্যাটার্টনের কথা শুনে প্রাণিত হয়েছিলেন 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনায়। এরপর জীবনদেবতা পর্ব থেকেই তাঁর সেই প্রেমচেতনা বিশিষ্ট রূপ নিল, সে-চেতনায় বৈষ্ণবতাও স্থান করে নিল কবির স্বকীয়তায় জারিত হয়ে। তার প্রমাণ খুঁজতে খুব বেশি প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, যে 'বীণা' আর 'বাঁশি' তাঁর গানে প্রায় রেকারেন্ট মোটিফের মতোই ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন তাৎপর্যে, মাত্রায় — তার প্রথমটি রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যের এবং দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকার।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন রস ও বিচিত্র পর্যায়ের কথা মনে রাখলে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গানে তার অনেকগুলিরই ভাবানুষঙ্গ খুঁজে নেওয়া যায়। 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে' কিংবা 'প্রভু আরও আরও আরও' — এ-সব গানে যেন দাস্যরসের সাধনা। সখ্যরসের ভাবনায় চকিতে মনে পড়ে যায় সচেতন বৈষ্ণবীয় রীতি অনুসরণে লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর সেই গান — " হেদে গো নন্দরানী / আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।" "আমরা হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি" —এ-গান যেন 'ভাবসম্মিলন'-এর। কিন্তু গহন-গভীর সংযতবাক্ রবীন্দ্রগানে যেন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে পদাবলীর 'অভিসার'-এর অনুষঙ্গ। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই 'অভিসার খুব গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায়, কেননা এখন ঘরছেড়ে পথে নামবার সময় হলো রাধার। কৃষ্ণের আহ্বানের কাছে, প্রেমের বেগ-আর আবেগের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল গৃহটান, কুল-শীল মান। তত্ত্বের দিক থেকে এ-যেন রাধার প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা। ঈশ্বরের সঙ্গে মেলবার পথে ভক্তের সঙ্গী নেই কেউ, সে-পথে একাকী তার যাত্রা। তাই 'উজ্জ্বলনীলমনি'তে 'অভিসারিকা'র সংজ্ঞায় রূপগোস্বামী একটি সখী-সঙ্গে রাধার অভিসারের কথাবললেও, বৈষ্ণব পদকর্তারা কিন্তু রাধাকে একাকিনীই পথে বের করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিসারভাবনার গানেও আছে অন্তরলোকে এক যাত্রার কথা, সে যাত্রাপথেও কবিপ্রাণ নিঃসঙ্গ, একা। যেন কবি জানেন— " যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা।/নয়নে আঁধার রবে ধেয়ানে আলোকরেখা।" বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন অভিসারের অষ্টপ্রকারের নিপুন চিত্রণ সত্ত্বেও কবির ঝোঁক বর্ষারাত্রির অভিসার বর্ণনাতেই, রবীন্দ্রনাথেও তেমনি। অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস বলেন সেই ঝড়ে-বিদ্যুতে-বজ্রপাতে ভীষণ-

ভয়াল রাতের কথা — যে রাত্রে পথ হয়ে থাকে 'শঙ্কিল-পঙ্কিল', যে রাত্রে "ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।/শুনতেই শ্রবণে মরম জরি যাত।। /দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।/ হেরইতে উচকই লোচন তার।।" সেই সূচীভেদ্য 'ঘন আন্ধিয়ার'এর সঙ্গে মিশেছে 'শতশত ভুজগভয়'। রবীন্দ্রনাথে এই অনুপুঙ্খ, বিশদ চিত্রধর্মিতা সংহত হয়ে এসেছে ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনায়। সেখানে আছে ঝড়ের রাতে পরানসখার অভিসারের কথা (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার), কিংবা সেই প্রবল ঝড়ে দুয়ার ভেঙে পড়ার বিপর্যয় (যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে)। কখনও সেই প্রবল ঝড়ে পথিক কবির 'বাতি নিভে যায়, ভুল হয়ে যায় পথ (যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি)। পদাবলীর জগতে যেমন এক নারী যাত্রা করে অভিসারে, রবীন্দ্রগানেও তেমনি কবিসত্তা প্রেমে, ভক্তিতে, নিবেদনে যেন এক অভিসারিকাই। তার নারী পরিচয় খুব স্পষ্ট নয় হয়তো, ঘোষিত নয় সবসময়, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই এক নারীসত্তাকে পুঞ্জীভূত দেখেন রবীন্দ্রনাথ, কবির অন্তর-যাত্রায় সেই অভিসারিকা। কিন্তু পদাবলীর প্রচলিত ধারা থেকে রবীন্দ্রনাথের গান পৃথক হয়ে যায়, যখন দেখি সেখানে 'অভিসার' এক-তরফা নয় মোটেই বরং দুতরফা। পদাবলীতে শ্যামের অভিসার যাত্রার পদ যে একেবারেই নেই তা হয়তো নয়, কিন্তু, পূর্ণশক্তির সঙ্গে মিলবার আকুলতা সেখানে অংশশক্তি রাধার দিক থেকেই অতল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও যখন ঈশ্বরকে দেখেন সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের কেন্দ্রে নিয়ন্তা হিসাবে, তখন অপূর্ণকেই তিনি 'পূর্ণের দিকে' চলতে দেখেন। আর বলেন, "পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে", সে শুধু বাজায় 'প্রতীক্ষার বাঁশি' 'সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।' কিন্তু সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে যখন তিনি পান অন্তরের লীলারহস্যে, তখন সেই চলাচল হয়ে উঠে উভমুখী। দেখা দেয় উভয়াভিসার। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি গানে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন — "কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে সে তো আজকে নয়"— তখন সেখানে কবিসত্তা বেরিয়েছে অভিসারে। আবার অন্য একটি গানে যখন বলেন —"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবের থেকে / তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে" — তখন সেখানে 'আমি' নয় তুমি'ই যাত্রা করেছে অভিসারে। কবিসত্তা যেন আছে প্রতীক্ষায় — কখনও 'দুয়ার খুলে' প্রিয়তমের আসার পথে চায়, কখনও বা 'বহুযতন করে' ধুয়ে-মুছে রাখতে চায় তার ঘর, তার অন্তরলোক— 'যদি আমায় পড়ে তাহার মনে'। আবার কখনও তিনি এসে পড়েন "অনাহূতের মতো" মরু পার হয়ে — তখন এই আক্ষেপে ভরে ওঠে কবিমন, যে, তাঁর প্রিয়কে তিনি 'পথের দুঃখ' দিলেন, 'কেন

চোখের জলে' পথের 'শুকনো ধুলো যত' ভিজিয়ে দিলেন না তিনি — পথকে করে তুললেন না কোমল, মসৃণ, সহনীয়। কখনও কখনও আবার প্রিয়তমের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন কবি — "ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে /আঁচল দিয়ে শুকাব জল মুছাব পা আকুল কেশে"। 'তিমির রাতি' 'নিবিড় হলে' প্রেমের বাতি জ্বেলে দেবেন তিনি, প্রিয়তমের জন্য 'পরানখানি' পেতে দেবেন, তিনি যেন তার ওপর চরণরাখেন। লক্ষণীয় যে, প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্গত এই গানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে কবির অন্তর্গত নারীরূপটি,আর বৈষ্ণবীয় একটি পরিমণ্ডল প্রেমে, ভক্তিতে, নিবেদনে, মিশে গানটিকে যেন ঘিরে থাকে। এইখানে — আর একটি কথা বলা জরুরি। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলায় অভিসারের পথ যতই দুর্যোগময়, ভীষণ, ভয়াল হোক, পথশেষের কান্ত কৃষ্ণ কিন্তুমধুরে মধুর। কিন্তু রবীন্দ্রগানে বহির্মুখী, মোহমূর্ছিত, বিমুখ কবিপ্রাণে কখনও কখনও রুদ্ররূপেও তাঁর আগমন প্রার্থিত। যে আঘাত সমস্ত বহির্মুখিতা আর বিক্ষিপ্ততা থেকে আবার কবির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে 'ভিতর পানে'। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই গানটির শেষাংশে কবি তাই বলেছেন— 'আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন / দুয়ার খুলিয়া, হে উদারনাথ, রাজসমারোহে এসো।/ বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধ ভুলায়, / ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।।" অথবা, অন্য একটি গানে কবির প্রার্থনা —"যদি, এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু/ দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে ফিরিয়া যেওনা কভু ।" এই অতন্দ্র পথচলার কারণেই রবীন্দ্রনাথের বহু গানে এই কান্ত সম্বোধিত হয়েছেন 'পথিক', 'পথের সাথী', 'পান্থ' এবং 'পান্থজনের সখা' রূপে। রবীন্দ্রনাথের গানে তাই অনেকসময়ই এইপারস্পরিক অভিসার পরিণত হয় যুগলচলনে। কবির 'পরাণসখা' কবিকে ডাক দিয়ে যান যাত্রাপথে, কবি সেই পথে তাঁকে অনুসরণ করেন। অন্ধকারে তাঁর উপস্থিতি হয়ত দৃশ্যমান হয় না, তবু কবি তাঁর 'একলা পথে চলা' কে 'রমনীয়' করে তুলতে চান এই বিশ্বাসে যে— "আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে"। পদাবলীর 'অভিসার' এর অনুষঙ্গ বহন করে আর একটি দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের গানগুলি স্বতন্ত্র এবং আধুনিক হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে শ্রীমতীর সাধনা নিজেকে ঘুচিয়ে দেবার সাধনা। নিজের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য মুছে দিয়ে সর্বার্থেই তিনি হয়ে উঠতে চান শ্যামময়ী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা বজায় রেখেও নিজের স্বাতন্ত্র্যের গৌরবটুকু ধরে রাখতে চান। তাঁর সাধনা নিজেকে মুছে দেবার নয়, নিজের 'হয়ে ওঠা'র সাধনা। 'নিভৃত প্রাণের' সেই দেবতার সঙ্গে না মিললে

তাঁর যেমন পূর্ণতা নেই, তেমনি তাঁকে না পেলে অচরিতার্থ থেকে যায় পরাণসখার প্রেমও। তাই একটি গানে তিনি বলেছেন — "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/তুমি তাই এসেছে নিচে/ আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর/ তোমার প্রেম হতো যে মিছে।" ঈশ্বরের লীলায় নিজ সত্তার এই মর্যাদা ঘোষনা রেনেসাঁ সম্ভূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই জয়ঘোষণা।

এবার কথাশেষের পালা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণফসল বৈষ্ণব পদাবলীও একালের পাঠককে টানতে পারে তার গুহ্যায়িত সম্মোহনে। তারও মধ্যে পাঠক হয়তো খুঁজে নিতে পারেন এক ব্যক্তিক লীলাজগৎ। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের মিথ্, তাদের সামাজিক পরিচিতি কিংবা, বৈষ্ণব তত্ত্বের গুরুভার আমাদের সংস্কারে এমনই দৃঢ়প্রোথিত যে, তার মধ্যে একালের মন ডানা মেলতে পারে না। এক হিসাবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের এইসব গানেও সংস্পৃষ্ট হয়ে থাকে গীতিকারের নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা। কিন্তু এ ঈশ্বর কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়, কবির একান্ত ব্যক্তিগত দেবতা। আর গানগুলি যেহেতু বাধা থাকে 'আমি' আর 'তুমি' এই দুটি সর্বনামে, তাই তার লীলারহস্যে ঝাঁপ দিতে পারেন যে-কেউ — তার নিজের মতো করে। এ-গান তখন হয়ে ওঠে তার 'আপন গান'। এমনকি আজকের ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন মানুষও এ-গানকে আস্বাদন করতে পারেন পরম গভীরতায়। তখন এ-গানের 'তুমি'-কে ভাবা যেতে পারে ব্যক্তিরই দ্বিতীয় সত্তা বলে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন — "আমার মধ্যে এমন আমি আছে যে আমার চেয়ে বড়ো, আমার মধ্যে তাকে কুলোবে কী করে।" সেই পরম সম্ভাবনাময় বৃহৎ 'আমি' কে কেউ ভাবতে পারেন গানের 'তুমি' হিসাবে। আর রবীন্দ্রগানের 'আমি' তখন হয়ে ওঠে প্রতিদিনের দিনযাপনে ধূসর, ব্রতস্খলিত খণ্ডিত 'আমি'। 'তুমি'র সুরে সুর মেলাবার প্রয়াসে যার সাঁঝ-বেলা গড়িয়ে যায়। সেই প্রয়াসই তো ব্যক্তির ক্রমশ 'হয়ে ওঠা'। কোনো এক নিভৃতিতে যে-কোনো সংবেদনশীল মানুষই শুনতে পান নিজের ব্যক্তিসত্তার গভীরে সেই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর। 'অতল জলের আহ্বান'-এর মতো যা ব্যক্তিকে কখনও শান্তি, ক্ষান্তি দেয়না — কেবলই তাকে ডাক দেয় প্রেয়বোধের জগৎ ছেড়ে শ্রেয়বোধের পথে। রবীন্দ্রনাথের এইসব অভিসার ভাবনার গান তখন 'বাহির দুয়ারে' কপাট ফেলে, ভিতরদিকে খুলে দেয় এক চলাচলের পথ — আমাদের ফিরিয়ে আনে কেন্দ্রের কাছে, আত্মস্থ করে। তখন প্রতিদিনের ধূসরতায় সেই গান হয়ে ওঠে এক বিরামহীন আত্মদীক্ষার, আত্মজাগরণের গান। সমস্ত বহির্মুখী বিক্ষিপ্ততায়, তুচ্ছ মোহের নাগপাশে ঘেরা জীবনে সে-গান হয়ে ওঠে এক সুনিশ্চিত বিশল্যকরণী।

রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রজীবন ও আমরা

বাসন্তী ভট্টাচার্য

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।

— আকাশের বিরাট সূর্য ভূমির শিশিরের কাছে যে মহত্বে ধরা দেয় অতি সাধারণ এই আমাদের কাছেও রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েন তাঁরই সহজ মহত্বে। বলাবাহুল্য বিপুল সে রবিকিরণকে একজীবনে পুরোপুরি ধারণ করা সাধ্যাতীত। তবু যে অনন্ত আলোর সন্ধান মন পায় তা তো জীবনের সম্পদ।

রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়ন এ রচনার উপলক্ষ্য নয়। এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে নিজের ক্ষুদ্রত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে যায় পাহাড় বা আকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তেমনি জীবনের আত্মিক সঙ্কটে নিজেকে বুঝতে ছুটে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। এ যাওয়া ভক্তের দেবতাসমীপে যাওয়া নয়, ছোট আমির বড়ো আমির কাছে যাওয়া। ভগবান-ভক্তের দূরবর্তী অবস্থান নয় বরং জীবনের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ। নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যর্থতা-সাফল্যের সামনে মনে পড়ে যায় তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ ব্যথাবেদনাকে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি বা না পারি তাঁর বেদনার বিপুলতা নিজের দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করায়। তাঁর জীবন, তাঁর দর্শন কখন যেন আমাদের মগ্ন চৈতন্যর অংশ হয়ে ওঠে। সচেতন মন বুঝে নিতে চায় রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রদর্শনকে। আর অবশ্যই মিলিয়ে নিতে চায় অতি আধুনিক এ জীবনকে রবীন্দ্রভাবনার আলোকে।

রবীন্দ্রজীবনের অন্যতম প্রধান দর্শনই হল গতি। গতি মানে জীবন। জীবন মানে কাজ। আর তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাজের তালিকা এত দীর্ঘ। যদিও তাদের কাজ না বলে রীতিমত কর্মকাণ্ডই বলতে হয়। বিপুল সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টির পাশাপাশি কত কী-ই যে করে গেছেন। ক) বিশ্বভারতী সৃষ্টি, তার প্রশাসনিক কাজ, শিক্ষকতা, অর্থ সংগ্রহের প্রাণান্ত চেষ্টা; খ) দেশবিদেশের আমন্ত্রনে সাড়া দেওয়া; গ) দেশের এবং বিশ্বের রাজনীতির

উত্থান-পতনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া জানানো— তা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই হোক বা স্পেনের গৃহযুদ্ধ; ঘ) শ্রীনিকেতনে সাধারণ মানুষের জীবিকানির্বাহের আয়োজন করা; ঙ) জমিদারী পরিচালনার কাজ। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিচিত্র কাজের তালিকায় মনে পড়বেই তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কথা যা অবশ্যই বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। এই স্বল্পপরিসরে এটুকু মনে রাখতে পারি কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ছিল কর্মযোগ, বিশ্বমানবতার দর্শন। পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে মনে করা যায়। গল্প-কবিতার পাশে পত্রের মধ্যে এমন এক সত্তা প্রতিফলিত হয় যা তাঁর জীবনদর্শনকে চিনিয়ে দেয় আরো স্পষ্টভাবে।

একথা কিন্তু মন ভোলে না যে এত কাজ করা মানুষটি সংসারবিযুক্ত মুক্তপুরুষ ছিলেন না। ছিলেন ভীষণভাবে সংসারী। তবু সমস্ত বন্ধনের মাঝেও এ জগৎসংসার সম্পর্কে রবীন্দ্রদর্শন মনে করিয়ে দেয় এ জীবনে নিত্যই নির্জন-স্বজনের সঙ্গম চলেছিল তাঁর জীবনে। সেখানে তঁ ার মন অসীম-অনন্তবিহারী। কিন্তু বাস্তব মাটির মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার, কর্তব্য, দায়দায়িত্ব কোন কিছুর থেকেই দূরে থাকেন নি । সত্যি কথা বলতে কি নানা কাজের রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় জাগায়, শ্রদ্ধা জাগায়। মন বলতে থাকে এ বিপুলতাকে একজীবনে বোঝার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তৈরী হতে থাকে একধরণের দূরত্ব—সম্ভ্রমের দূরত্ব। অনেকটা সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়ালে যেমন হয় আর কি। কিন্তু যখন তাকাই সংসারী মানুষটার দিকে মনে হয় গুটি গুটি পায়ে গিয়ে বসি মানুষটার কাছে। প্রতিদিনের জীবনের দায়দায়িত্বের সামনে যখন নিজের জন্য দুদণ্ড সময় বার করতে হিমসিম খাই অথচ ঠাণ্ডা মাথায় সেই প্রাত্যহিক গ্লানিকে নিঃশব্দে নিজেরই কাছে সহনীয় করে তুলতে হয় তখনই বুঝি সংসার-বিচ্ছিন্ন কোন সাধনক্ষেত্র নয়, সংসারই সবচেয়ে বড়ো সাধনার স্থান। সমস্ত বন্ধন থেকে নিজের স্বার্থ যখন ছুটি পেতে চায়, অনিবার্য পদক্ষেপে সামনে এসে দাঁড়ায় বহুপরিচিত পংক্তিদুটি —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।

— নেহাৎ কেজো প্রয়োজনে বহু ব্যবহৃত পঙক্তিদুটি কখন যেন নিজের কাছে শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মনে হতে পারে যে, যে সংসারজীবনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুক্তির দর্শন আলোচিত হয় তা না জানি কত সুখের ছিল। সত্যিই

তো সুখের আয়োজনের তো কোন ত্রুটি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সম্ভ্রান্ত ধনী, শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন। ধন-মান-জন কোনটারই অভাব ছিল না জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। অথচ সারজীবন ধরে ধনের চিন্তা তাঁকে অস্থির করেছে, চিন্তিত করেছে, বিব্রত করেছে। সারাজীবন অর্থের চিন্তায় যেভাবে তাঁকে কাতর হতে হয়েছে তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবকাশ তৈরী করে। সংসার চালানোর খরচ তুলতে গল্প লিখে পাঠাতে হয়েছে পত্রিকায়, শান্তিনিকেতন গড়তে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছে বিশ্বভারতীর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তোলার জন্য। অবিশ্বাসী অসহিষ্ণু মন বলতে চায় এ আর এমনকি বেশী ব্যাপার। একটা লোক নিজের সংসার চালাতে গল্প লেখে, নিজে যা গড়তে চায় তার জন্য স্ত্রীর গয়না বেচে সে তো হতেই পারে। পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় স্ত্রীর গয়না বেচে, গল্প লিখে, টাকার যোগাড় করে মানুষটা যেটা তৈরী করতে চায় তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তৈরী করতে চায় আন্তর্জাতিক মানের মানবিক একটা স্কুল। স্কুলের শাসন মেনে নিতে না পারা সারাজীবন স্কুলছুট একজন মানুষই তো বুঝেছেন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আনন্দকে। যেআনন্দের আদি উৎস প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে যুক্ত করতে চেয়েছেন শিক্ষার সঙ্গে। আজও যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভে তথাকথিত ব্যর্থ পড়ুয়া আত্মহননের পথ বেছে নেয় বা মনোরোগের শিকার হয় তখন মনে পড়ে বৈকি শিক্ষাবিষয়ক রবীন্দ্রদর্শনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধুই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন না, শিক্ষার আনন্দহীন ভারবহনের প্রাণঘাতী ক্লান্তি থেকে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করতে হয়ে ওঠেন অপরিহার্য।

ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের কথায়। কুসুমাস্তীর্ন ছিল না সে পথ। জমিদার বংশে জন্মেছিলেন বলেই আমৃত্যু কাব্যসাধনা সম্ভব হয়েছিল এধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার তাঁকে জীবিতকালেই হতে হয়েছিল। ১৯১৩ সালে যখন তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত তখনও কিছু লোক বলে গেছে শাসক শক্তির দেওয়া পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ। নতুবা তিনি বুর্জোয়া কবিহিসাবে চিহ্নিত হবেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে যে মানুষটা সর্বদাই অর্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত নোবেলের অর্থমূল্য তাঁর কাছে এক বিরাট সুরাহার পথ। সে পথে অপমানের কাঁটা বিছানো থাকলেও তাঁর যে কিছুই করার নেই।

এ অপমান শুধু বাইরের নয়, ঘরের মধ্যেও সইতে হয়েছে বিশ্বকবিকে।

একদিকে নোবেল কমিটি চিঠি লিখছে পুরস্কার গ্রহনের জন্য আর কী আশ্চর্য একই সময়ে তিনি কলহরত দুই জামাইয়ের মধ্যে মিটমাটের আশা নিয়ে নিজে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখছেন জামাইদের। বিশ্বকবির এই যন্ত্রনা মুহূর্তে চিনিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি নয়, তিনি একজন মানুষ। যে মানুষটা চিঠি লিখে স্ত্রীকে জানায় — 'আমার নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয়।' বিরাট মাপের মানুষটার ভেতরেও তাহলে চলতে থাকে নিজেকে বোঝানোর প্রক্রিয়া। সহ্য করার যে শক্তিকে আপাতভাবে অতিমানবিক বলে মনে হয় তার ভেতরেও খুঁজে পাওয়া যায় একজন ধৈর্যশীল মানুষের ছবি। এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন — '..... যখন কেউ আমার প্রতিকূলতা করে তখন তার সম্বন্ধে আমার মন সতর্ক হয়ে থাকে, পাছে বিদ্বেষবুদ্ধিতে তার প্রতি কথায় বা ব্যবহারে ভুল করি, এই ভাবনাটা থেকে যায়'। আবার বলছেন, 'বাইরের পরে বিরক্ত হয়ে নিজের ভিতরকার সামঞ্জস্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলে তাতে নিজের ভারি লোকসান'। বাইরের বৃহৎ কর্মজগৎ শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনে নিজের কাছে নিজের প্রস্তুতিতেও রবীন্দ্রজীবনদর্শন পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রজীবনদর্শনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তাঁর জীবনে পাওয়া একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুশোককে অনুধাবন করি। প্রিয়জনের মৃত্যু যেন মিছিলের মতো চলছে। সে মিছিলে প্রথম মুখ তাঁর মায়ের। বৃহৎ পরিবারে ভৃত্য শাসনে বালককাল অতিক্রম করতে না করতেই মাকে হারিয়েছেন। কিন্তু সে মৃত্যু কোন ভয়ংকরতার প্রমাণ রেখে যায়নি। শিশু বয়সের লঘুতা সে মৃত্যুকে পাশ কাটিয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে বৌঠানের মৃত্যু বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে স্থায়ী পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়ের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।১৯০২ সালে হারালেন স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে। স্ত্রী কেবল স্ত্রীই নন তিনি সন্তানের মাও বটে। এর পরবর্তী বছরগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যথিত হতে হয়েছে। সন্তানশোক বহন করতে হয়েছে একাকী নিঃসঙ্গ পিতাকে। কবির মেজ মেয়ে রেণুকা মারা গেল ১৯০৩ সালে। রাত জেগে মেয়ের সেবা করেছেন কবি নয় পিতা। মৃত্যুশয্যায় মেয়ে বাবার কাছে শুনতে চেয়েছে উপনিষদের মন্ত্র — ওঁ পিতা নোঽসি — তুমি আমাদের পিতা তোমায় নত হয়ে যেন মানি। মৃত্যু যে জীবনেরই অন্যতর প্রকাশ। মৃত্যুর বিরূদ্ধে উন্মত্ততা নয়, এ মন্ত্র সংযত, বিনম্র, দ্বন্দ্ব- উত্তীর্ণ পূর্ণতার মহামন্ত্র।

কন্যার মৃত্যুর দুইবছর পরে ১৯০৫ সালে চলে গেলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ।

পত্নী, কন্যা, পিতার মৃত্যুতেও ব্যথার পূজার সমাপন হল না। ১৯০৭ সালে অকস্মাৎ মারা গেল কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। বন্ধুর সাথে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে এ মৃত্যু বড়ো আকস্মিক, বড়ো বেদনাদায়ক। ক্লিষ্ট পিতৃহৃদয় বলে, 'আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি- তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতেই মন দিতে পারিব না।' হৃদয়ের ব্যাকুলতা সান্ত্বনা খুঁজে পেল বিশ্বসংসারের নিত্যপ্রবাহে -'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাতে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বলল কম পড়েনি- সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল।'

সত্য সত্যই তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, ব্যথা তাঁর কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এত শোকের মধ্যেও তাঁর নানাবিধ কাজ ও সাহিত্য চর্চার নিরন্তর প্রবাহ থেমে যায় নি। থেমে থাকে নি তাঁকে দেওয়া তাঁর জীবনদেবতার রুদ্র নিষ্ঠুর আঘাত।

বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা যাঁকে আদর করে ডাকতেন কখনো বেলি কখনো বেলুবুড়ি। তাকে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি রোগ ধরা পড়ল বেলার। যক্ষ্মারোগ। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু রোগের গতি একটাই অনিবার্য পরিণতির ইঙ্গিত করছে বারবার। শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন, 'তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।' বুঝতে কষ্ট ছিল না কন্যার যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে। শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা চলছে কবির। রোজ সকালে মেয়ের কাছে বসে গল্প শোনান। একদিন সব শেষ হল। শেষ হলনা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা। সেই সন্ধ্যাতেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা'র বৈঠক। ব্যবস্থার কোনো বদল হলনা। সমস্ত বেদনা সমস্ত স্মৃতি হৃদয়সমুদ্রের কোন গভীরে লুকিয়ে গেল। অস্ফুট কিছু কথা জেগে রইল 'পলাতকা' য়।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে রয়ে গেলেন মীরাদেবী এবং রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসন্তান। পিতামহের স্নেহ দিয়ে যাকে ঘিরে রেখেছিলেন সেই মীরাদেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথকে কবি পাঠালেন য়ুরোপে ছাপার কাজ শিখতে, প্রকাশন শিল্প আয়ত্ব করতে। তরুণ নীতিন্দ্র আক্রান্ত হলেন মারণব্যাধি ক্ষয়রোগে। রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু এণ্ডরুজ তখন তার পাশে। ছুটে গেলেন মীরাদেবী, নীতিন্দ্রের পিতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু সব চেষ্টা

ব্যর্থ করে নীতু চলে গেল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর বছর।

মৃত্যু নিয়ে, শোক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা কত গান। বারবার একই কথার উচ্চারণ যে ফুল না ফুটে ঝরে গেল, যে নদী মরুতে পথ হারালো তাও আছে, কিছুই হারায় না। এ যে নিছক কাব্যকথা নয় তা তখনই বুঝি যখন নিজের জীবনে ঝড় আসে, দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে। উঠে দাঁড়ানো তো দূরের কথা মাথা তোলার শক্তিও থাকে না। মনে পড়ে যায় তাঁরই কথা — 'যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।' এ যে কতো বড়ো সত্য তা তো রবীন্দ্রনাথ প্রমান করে গেছেন নিজের জীবনে সমস্ত দুঃখ আঘাতকে ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। নিজের জীবনে যখন সুখের বিঘ্ন ঘটে মন তখন অস্বীকার করতে চায় মঙ্গলময়ের অস্তিত্বকে। তাঁর মতো বলতে পারি কি সুখ যদি ঈশ্বরের দান হয় তবে দুঃখও তাঁরই দান। কী গভীর আস্তিক্য বিশ্বাসে তিনি উচ্চারণ করেন —

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক।

আজ আমরা যত আধুনিক হয়ে উঠছি তত নিঃসঙ্গও হচ্ছি। এই নিঃসঙ্গতায় যাঁকে আরো বেশি অনুভব করি তিনি রবীন্দ্রনাথ। আধুনিকতার সমস্ত বাহ্যিক উপকরণ আজ আমাদের করতলগত। কিন্তু মননজাত প্রকৃত যে আধুনিকতাবোধ আমাদের শতাব্দী অতিক্রমী আধুনিক করে তুলতে পারে তা আজ সারা বিশ্বেই বিপন্ন। ক্ষমতা দখলের লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা, নারী-পুরুষ ভেদে মনুষ্যত্বের অবমাননা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রদর্শনের নিবিড় অধ্যয়নের অঙ্গীকারই হোক যাবতীয় তমোনাশের বীজমন্ত্র।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) ছিন্নপত্র — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২) পথে ও পথের প্রান্তে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩) পথের সঞ্চয় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪) বাইশে শ্রাবণ — নির্মলকুমারী মহলানবীশ
৫) তবে তাই হোক — সোমেন্দ্রনাথ বসু

প্রতিবাদী সাহিত্য ঃ নজরুল ইসলামের কবিতা

চন্দনা সামন্ত

প্রতিবাদ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রতিবাদ মানুষের চৈতন্যের গভীরের একটি প্রবাহ। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই এই প্রবাহ মানুষের রক্তের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে আসছে। তাই মানুষ প্রকৃতির কাছে মাথা নত না করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতেই এগিয়ে চলেছে সভ্যতার দিকে। মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রতিবাদ এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের কবিরাই তো মাতৃভাষা বাংলায় চর্যাপদ রচনা করে প্রতিবাদের সূত্রপাত করেছেন। সেই সময় সংস্কৃতভাষাই ছিল ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ প্রকাশের মাধ্যম। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শগুলিকেও মান্য না করে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই যে প্রতিবাদের সূত্রপাত তাই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদী সাহিত্য, সাহিত্যের স্বতন্ত্র কেনো বিভাজন নয়, সাহিত্যের মধ্যেই প্রতিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের উপন্যাস ছোটগল্প নাটক কাব্য প্রভৃতি শাখাতেই কমবেশী প্রতিবাদের ধারা প্রবাহিত। আসলে বিবেকমান মানুষ মাত্রেই তো প্রতিবাদী। কাজী নজরুল ইসলামও তার ব্যতিক্রম নন।

কাজী নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদ প্রত্যক্ষভাবেই ধরা দিয়েছে। কবি হিসাবে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি। যদিও এই পরিচয় তাঁর শেষকথা নয়। কোনো নির্দিষ্ট তকমায় কবিকে বেঁধে দেওয়া যায় না। প্রেমের অজস্র গান ও কবিতা তিনি রচনা করেছেন। যেহেতু নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদের স্বরূপটি ধরা আমার আলোচনার বিষয় তাই এক্ষেত্রে প্রতিবাদী ধরনের কবিতাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। তাঁর কবিতায় এই প্রতিবাদের স্বরূপটিকে জানতে হলে প্রথমে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবকালীন সময়টির কথা স্মরনে রাখা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তখন পরাধীনতার নিপীড়নে সারা ভারত জর্জরিত। অন্যদিকে সামাজিক রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্য ও বৈষম্য জনজীবনকে কলুষিত করছে। ভারতবর্ষকে সমস্ত রকমের পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়েই নজরুল কলম ধরেছিলেন। প্রাক্ নজরুল যুগে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনাতে প্রতিবাদ অবশ্যই ছিল। তবে নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদ সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে।

নজরুলের প্রতিবাদ মূলতঃ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অর্থবৈষম্যের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং নারী পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। নজরুল মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন। মানুষের ব্যথা ও বেদনা তাঁকে গভীরভাবে আহত করে। তাই মানুষকে নির্যাতিত ও অবমানিত হতে দেখলেই স্বভাববশতঃ প্রতিবাদ না করে পারেন না। মানুষকে তিনি অত্যন্ত উচ্চে স্থান দিয়ে বলেছেন - "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।" (মানুষ-সাম্যবাদী)। বলা যেতে পারে রবীন্দ্র পরবর্তী বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কবি হলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর জীবনটাই তো প্রতিবাদ। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' (১৯২৩) কবিতাটির জন্য তাঁকে কারাবাস করতে হয়।

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় কবির প্রতিবাদ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। কবি বলেছেন -

"আর কতকাল থাকবি বেটীমাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?"

'সর্বহারা' কাব্যের 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটিতেও ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্রান্তের প্রতিবাদ করেছেন। ইংরেজরা চক্রান্ত করে এদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। কবি ইংরেজদের এই কুটিল চক্রান্তের বিরোধিতা করে বলেছেন -

"হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওউ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

হিন্দু মুসলিম এই ভেদাভেদকে অস্বীকার করে সকলকে মানুষের সন্তান বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। 'ফরিয়াদ' কবিতায় তিনি শাসক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আদি পিতা ভগবানের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এ অভিযোগের মধ্যে কবির প্রতিবাদী সুরটি ঝঙ্কৃত হয়েছে।

"সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।"

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে নানাভাবে। একই কবিতায় ইংরেজ জমিদার ধর্মের ধ্বজাধারী ব্যক্তি এমনকি ঈশ্বরের

বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আসলে যা কিছু অন্যায় তার বিরুদ্ধেই কবির প্রতিবাদ। এই 'ফরিয়াদ' কবিতাতেই জমিদার ও মহাজনদের (শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেছেন ঈশ্বরের কাছে।

"জনগনে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন।
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান্।

কুলিমজুর কবিতায় অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি সঙ্গতিসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন—

"বেতন দিয়াছ? চুপ্ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল।"

যেখানেই অন্যায় সেখানেই কবির লেখনীতে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের ভেদাভেদ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই 'নারী' কবিতায় এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কবি তাই বলেছেন -

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।"

এখানেই তিনি ক্ষান্ত হয়নি। নারীকে প্রতিবাদী হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন -

" — হাতে রুলি পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ।

নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে প্রতিবাদী ও আধুনিক। কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সকলকে কুসংস্কারের উর্দ্ধে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে নারীর অবমাননা কবি মেনে নিতে পারেন নি। কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষ নারীরর গায়ে কালিমা লেপন করেছে। বারাঙ্গনা বলে ঘৃণা করে। তাই ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের উদ্দেশ্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন 'বারাঙ্গনা' কবিতায়। বলেছেন - 'জন্মের পর মানবজাতির থাকে না'ক কোন গ্লানি।'

ব্রিটিশ সরকারের শোষনের বিরুদ্ধে যেমন কবির প্রতিবাদ থামে নি, তেমনি এদেশের প্রচলিত সমাজ সমস্কারের অনয়িম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় বসে শুধু ঈশ্বরের উপাসনা করলেই যথার্থ ধর্ম লাভ হয় না। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হৃদয় মন্দিরে। 'সাম্যবাদী' কবিতায় প্রচলিত ধর্মাচরনের বিরোধিতা করে লিখেছেন -

"এই হৃদয়ই যে নীলাচল, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা, ভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়।
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।"

শাস্ত্র কঙ্কাল পাঠে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ 'সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ।' এইরকম উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তখনো পর্যন্ত নজরুলের লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। 'মানুষ' কবিতাতেও ধর্মের ধ্বজাধারী ভণ্ডদের আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। নজরুল কোনো ধরনের ভণ্ডামিকেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই রাজনৈতিক ভন্ডদের উদ্দেশ্যে করে বলেছেন -'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না, স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন' (আমার কৈফিয়ৎ)। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটিতে কবি যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা কেবল সমালোচনার জবাব নয়, স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষায় আত্মসমালোচনার ভঙ্গীতে প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন - "রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।" ক্ষুধার্ত শিশুর পক্ষ নিয়ে সেইসব স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন - "ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন/ কেন ওঠে নাক তাহাদের গালে যারা খায় এই শিশুর খুন?" এছাড়া 'ভাঙার গান' চাষার গান, প্রভৃতিতে ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাঙার গান' - এ কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ তীক্ষ হয়ে উঠেছে। বলেছেন -

কারার ওই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকলপূজোর পাষাণ বেদি।

নজরুলের সমস্ত কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে 'অগ্নিবীনা'র 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সেইসময় এত আলোড়ন তুলেছিল যে এই বিশেষণটি নজরুলের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই কবিতাটিতে নজরুলের জীবনের ও কবিমানসের সম্যক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালে। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যে নজরুলের উপর অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ

বর্ধিত হয়। সেই আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল প্রচলিত 'আমি' ধারনার বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করেছেন। নতুনভাবে নিজেকে আবিস্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তা র প্রাণের আবেগ *এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে -*

'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুখিয়া রাখিতে নারি।'

সেখানে নজরুল প্রাণের আবগের প্রকাশ ঘটিয়াছেন সোচ্চারে। প্রতিটি মুহুর্তেই প্রতিবাদ ঝলসে উঠেছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। তাই বলেছেন -

''আমি নৃত্য - পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্তজীবনানন্দ।'

কখনো বলেছেন 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ', 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস', কখনো আবার বলেছেন 'আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন।' এইভাবে পরস্পর বিরোধী ভাববর্ত আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে কবিতাটিতে। আবার এই কবিতাতেই নজরুল উচ্চারণ করেছেন - 'আমি সেইদিন হবো শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,- অর্থাৎ মানবাত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিবাদ করেই যাবেন এই তাঁর দৃঢ় সংকল্প।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। নজরুল চরিত মানস - ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত।
২। কাজী নজরুল ইসলাম ও সঞ্চিতা - ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত।
৩। নজরুল কাব্য পরিচয় - মধুসূদন বসু।
৪। কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সৃষ্টি - রফিকুল ইসলাম।

মুক্তবুদ্ধি রোকেয়া ঃ কন্যা থেকে নারী

— ডঃ মমতাজ বেগম

ট্রাডিসন বা গতানুগতিকতার সমান গতির মাঝে মুক্তবুদ্ধি রোকেয়া এক বিরল ব্যক্তিত্ব। আধুনিকতা, প্রগতি, গতিশীলতা এবসবের মূল উৎস মুক্তবুদ্ধির বিকাশ সাধন। প্রচলিত সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণরূপ বিচলিত করেছিল বলেই অগ্রবর্তী চিন্তাশীল মনস্বিনী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুক্তবুদ্ধির বিকাশ চেয়েছিলেন মনে প্রাণে। আত্ম নির্ভরশীলতা, আত্মসম্মান জাগরণ, নারী ব্যক্তিত্বের উন্মেষ, চরিত্রের স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল রোকেয়ার জীবন ও কর্মসাধনার মূল ব্রত। বেগম রোকেয়া কিভাবে সাধারণ কন্যা থেকে পরিপূর্ণ নারীতে উত্তীর্ণ হলেন তা জানলে আজকের নারী সমাজ হয়তো জীবনের পথ খুঁজে পাবে।

রোকেয়া সময় - সমাজ ও প্রেক্ষিতকে যুক্তিবাদী মন নিয়ে শুধু অনুসন্ধানই করেননি; আত্মোপলব্ধির তিক্ততা, নৈরাশ্য, যন্ত্রনা, সার্বজনীন ব্যাপকতায় প্রসারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য ও কর্মের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যংলার জাগরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা। বেগম রোকেয়া সেই জাগরণের অগ্রগন্য পথিক। রক্ষণশীলতা, কুপমন্ডুকতার উচ্ছেদ সাধনের দীর্ঘ সংগ্রামে তাঁর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আত্মপ্রস্তুতির একের পর এক স্তর অতিক্রম করে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা, গোঁড়ামি, পুরুষ শাসন প্রভৃতির নিঃশ্ছিদ্র পর্দাকে সরিয়ে দিয়ে আলো প্রবেশের চেষ্টা করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত দুঃখ, যন্ত্রনা, গ্লানিকে আত্মস্থ করে সার্বজনীন ব্যাপকতায় পৌঁছেছিলেন বলেই আজও তাঁর জীবন ও কর্ম বিশেষ তাৎপর্যবহ।

কন্যা রোকেয়া আর পাঁচটা গড়পড়তা নারীর মতই জন্মেছিলেন মুসলমান সমাজের আভিজাত্যের অন্তপুরে। বঙ্গের মুসলিম অসংখ্য নারী যেমন সমাজের নিষ্ঠুরতা, অবিচার, আত্মীয় প্রতিবেশীদের গঞ্জনার স্বীকার রোকেয়াও সেরূপভাবেই তাঁর ছোটোবেলা শুরু করেছিলেন। তাঁর 'অবরোধবাসিনী'-র (পৃ-৪৪৭) বক্তব্য থেকে জানা যায় -

'আমার পঞ্চমবর্ষ বয়সে কলকাতা থাকাকালীন, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ি বোহার হইতে দুইজন চাকরানী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাদাদের ফ্রি পাসপোর্ট ছিল। তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া

বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণ শিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র কপাটের অন্তরালে কিংবা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম।'

শৈশবের সমান্য লেখাপড়া ছাড়া আনুষ্ঠানিক কোন বিদ্যাশিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় থাকাকালীন এক মেম শিক্ষিকার কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু 'মেম সাহেবের ছাত্রী হলে পর্দার খেলাপ হয়' - এই খোঁড়া যুক্তিতে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রোকেয়ার দুই ভাই সমাজের ও অভিভাবকের অগ্নিদৃষ্টি খর্ব করে গোপনে বোনকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবরুদ্ধ নারীত্বের যন্ত্রনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে কন্যা রোকেয়ার প্রথম পথ চলা শুরু। গতানুগতিক পরিবার থেকে এইটুকু ব্যতিক্রমী সাহায্য পেয়েছিল বলেই হয়তো কন্যা থেকে নারীতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তবে নারীর যন্ত্রনা নারী যেমন করে বোঝে হয়তো বা ভাইরা ততটা বুঝতে পারে নি। তাই রোকেয়ার বোনেদের দানও কম নয়। প্রসঙ্গত ভাইবোনের দানের দুটি উদাহরণ তুলে দেওয়া যেতে পারে -

'খাওয়া দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দুই ভাইবোন বসেন পুঁথিপত্র লইয়া। গভীর রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া ওঠে দুইটি কিশোর - কিশোরীর শয়ন কক্ষে স্তিমিত দীপ শিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দুই ভাইবোনে মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞানদান করেন ভাই, আর বালিকা ভগ্নী সেই জ্ঞান-সুধা আকণ্ঠ পান করেন।'

- (শামসুন্নাহার - সমসাময়িক সাহিত্যিকের চোখে বেগম রোকেয়া)

রোকেয়াকে দুর্গম জীবন-পথের যোগ্য অভিযাত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে বড় বোন করিমুন্নিসার অবদানও কম নয়। কুরমুন্নিসা তাঁর ছেলে আব্দুল হালিম গজনভীর সঙ্গে রোকেয়ার পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রোকেয়ার নিজের কথায় - "আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ..... নানা অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে"।

স্বদেশী বিদেশী যে কোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে বিন্দুমাত্র সুযোগ পেয়েছেন তাকে জীবনপণ করে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে। এভাবেই কন্যা রোকেয়া শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে।

মুসলমান সমাজে সাধারণত যে বয়সে বিয়ে হত তার তুলনায় রোকেয়ার যথেষ্ট বেশি বয়সে বিয়ে হয়। রোকেয়ার বয়স তখন ষোলো। আঠত্রিশ

বা তার বেশি বয়স্ক এক দোজবরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কেবলমাত্র মহৎ জীবনাদর্শ ও শিক্ষিত মানসিকতা দেখেই এই বিয়ে হয়। একজন সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রী হিসেবে সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রেও স্বামী শাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা আছে যথেষ্ট কিন্তু স্ত্রী হিসেবে জায়া হিসেবে, তিনি সুখী ছিলেন না বলেই মনে হয়। কারণ -

'শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ ইউরিন পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি।'

একদিকে পিতার বহুবিবাহ অন্যদিকে স্বামীর। এই দুয়ের আঘাতে জর্জরিত রোকেয়া তাঁর বেদনাকে নির্মম বিদ্রুপাত্মক ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়। বিবাহিত জীবনে রোকেয়া ছিলেন এক প্রবঞ্চিত নারী। তাই মেরী করেলীর জনপ্রিয় কাহিনী Murder of Delicia অনুবাদ করে বলেছেন -

"এ পোড়া ভারত অন্তঃ পুরের কথা
জানিল কি ছলে মেরি করেলী"

রোকেয়া যেন নির্যাতিত করেলীর ডেলিশিয়ার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। হতবাক হয়ে যেন ভেবেছেন, হায় হতভাগ্য নারী —

'মরার আগে কেন বার বার মরি।'

রোকেয়ার কোন গ্রন্থ তাঁর পিতা বা স্বামীর নামে উৎসর্গিত নয়। স্কুলের নাম রাখার পিছনে যে কারণটি ছিল তা হল স্বামীর উপার্জিত অর্থে এই স্কুল শুরু করেছিলেন বলে বোধ হয় স্কুলের নাম রাখেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। দু একটি পত্রে একবার আধবার উল্লেখ ছাড়া স্বামী সম্পর্কে নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই করেননি। বোধ হয় সচেতন ভাবেই পরিহার করেছেন। স্বামীর কাছেও তাঁর প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর স্তিমিত থাকেনি -

'তোমার বন্ধু তাঁহার পত্নীর ব্যারামে পনের মাসের ছুটি লইয়া চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। উঁহাদের বংশে বিবাহ একবার মাত্র হয় - স্ত্রী পুরুষ কাহাকেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে নাই, এই মত পোষিত হইয়া আসিতেছে। আমার ব্যারাম হইলে তুমি অতটা করিবেনা। তুমি আবার তৃতীয় বিবাহ করিতে অধিকারী কিনা।'

রোকেয়া জীবনে 'মা' হওয়ার স্বাদ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এক ব্যর্থ জননীর অভিশাপ মাথায় নিয়ে অন্যের সন্তানকেও আপন স্বত্তায় লালন পালন করতে চেয়েছিলন কিন্তু রোকেয়া সেখানেও ব্যর্থ। তাঁর ব্যক্তিগত পত্র থেকে

জানা যায় -

'দুবার মা হয়েছিলুম - তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন পাঁচ মাস বয়সে, অপরটি চার মাস বয়সে চলে গেছে।'

বিবাহিত জীবনের তীব্র হাহাকার, ব্যর্থতা, শূন্যতাবোধ রোকেয়াকে দিন দিন অবলম্বনহীন করে তুলে ছিল। এমত অবস্থায় ছোটবোন হোমায়রার শিশু কন্যা নূরীকে আপন সন্তানের মত মানুষ করার জন্য নিয়েছিলেন। নূরীর মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়সে রোকেয়ার স্নেহাঞ্চল ছিন্ন ভিন্ন করে নূরী মৃত্যুবরণ করে। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করেও জীবন অন্বেষনের অবলম্বনহীন পথিক আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। আত্মীয় স্বজনদের কাছে একটি মেয়ে চেয়েছিলেন কিন্তু কেউই তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। বিশেষতঃ নূরীর মৃত্যু যেন রোকেয়াকে সমাজের চোখে 'অপয়া' করে তুলেছিল।

নিঃসন্তান হয়ে থাকার বেদনায় পীড়িত সাখাওয়াতের অভিন্ন হৃদয়বন্ধু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি শিশুপুত্র দত্তক হিসাবে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুকুন্দদেব সে উদারতার পরিচয় দিতে পারেননি। রোকেয়া তখন অন্য আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নারীত্বের পূর্ণতা খুঁজেছিলেন মাতৃত্বে। সমকালে প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা যেন আরও বেশি পীড়িত করে তুলেছিল -

'ছেলে কোলে নাই যার
যত কিছু সব তার মিছে।' এই বাক্যে।

১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামী সাখাওয়াতের মৃত্যু হলে জায়া ও জননী হবার ক্ষীন স্বপ্নটুকু মিলিয়ে যায়। উর্দু ভাষী ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে, রুগ্ন স্বামীর সন্নিধানেও জীবনকে অনুসন্ধান করেছেন বারবার। সেখানেও (বিহারের ভাগলপুরে) মেয়েদের দুর্দশার চিত্র রোকেয়াকে ব্যথিত ও মর্মাহত করে তোলে। এবার রোকেয়া নিজেকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন নারীত্বের মধ্যে।

স্বামী হারানোর শোক কাটিয়ে উঠে (পাঁচ মাস পর) পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরের খলিফাবাগে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু সমাজের ও আত্মীয় স্বজনের প্রবল বাধার সামনে রোকেয়া যখন মাথা নত করেনি, তখন 'মিশনারীদের চর' ও 'দুঃশ্চরিত্রা' অভিধা দেয়। এমনকি তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় বোন হোমায়রা ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মালিকের সহায়তায় কলকাতায় ফিরে আসেন রোকেয়া। সহস্র বিপদের সামনেও অশোভন উচ্চকণ্ঠ বা নীরব আত্মহননের উত্তাপ

কোনোটাই তাঁকে প্রকৃত নারী হয়ে ওঠা থেকে বিরত করতে পারেনি। গোলাম মোস্তাফা মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 'দুঃসাহসিকা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন যা খুবই যথার্থ -

সাড়া দিল নাকো কেহ সেই ডাকে - সে আকুল আহ্বানে,
জননী টানিছে একদিকে - আর মরণ ওদিকে টানে।
কেহ জাগে, কেহ জাগিয়া ঘুমায়, কেহ ধীরে মেলে আঁখি
ধিক্কার দেয় কেহ জননীরে ঘুম ঘোরে থাকি থাকি।
সন্তান ভোলে জননীরে, তবু জননী ভোলে কি তায়?
প্রাণ কাঁদে তাঁর স্নেহ মমতায় - কল্যাণ কামনায়।
তাই কি জননী বিপুল ব্যথায় ভরিল তোমার প্রাণ?
ভুলে গেলে তুমি আমাদের যত অনাদর অপমান।
শুচি সুন্দর শুভ্রবসনা তপস্বিনীর প্রায় -
বসিলে গহন রাতের আঁধারে আলোর তপস্যায়?
ঘুমায় পুত্র ঘুমায় কন্যা সজাগ প্রহরী সম
দরদী জননী শিয়রে জাগিয়া, দৃশ্য এ অনুপম।

এই কবিতা রোকায়ার প্রকৃতিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। কলকাতায় আসার পর ১৩ নং ওয়ালীউল্লাহ লেনের বাড়িতে ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু করলেন, আটজন ছাত্রীকে নিয়ে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় (দি মুসলমান, মোহাম্মদী) তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের নবজাগরণের দীপ্ত আলোকচ্ছটা মুসলমান নারীদের জীবনে ক্ষীনভাবে দেখা দিয়েছিল। তাকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্যই গৃহ প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ, অজ্ঞানতার আঁধারে লক্ষভ্রষ্ট নারীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে অন্বেষণ করেছেন পূর্ণ নারীত্বে। অব্যাহত উৎসাহ, প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত সহায়তা, অক্লান্ত উদ্যোমে পর্বত-প্রমাণ বাধা ও সরকারী নীরবতা (অর্থনৈতিক) অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছাড়া সহস্র বন্ধন একের পর এক ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই স্বরব প্রতিবাদে গর্জে উঠে স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উজ্জীবিত হলেন। যন্ত্রনা, হতাশা, নৈরাশ্যের মধ্যেও জীবনের প্রতিটি পর্বেপর্বান্তরে নিজেকে অন্বেষণ করেছেন। নজরুলের মত যেন তিনিও ভেবেছিলেন-

'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'

অথবা

'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।'

এত তীব্র যন্ত্রনা ছিলো বলেই রোকেয়া পরিপূর্ণ নারী হতে পেরেছেন, বলতে পেরেছেন নারীর যন্ত্রনাকে নারীর হয়ে।

সামাজিক বিরোধিতা, নানা বিপর্যয়, চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও কয়েকজন শুভমূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের সহায়তায় রোকেয়া প্রতিবন্ধকতার তীব্র ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন, কখনো বিনাবেতনে, কখনো স্বল্পবেতনে, কখনো যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়, যুগোপযোগী ও সুসমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করে নারীকে যুগের উপযোগী করে পুরুষের ব্রতের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। এই মহানযজ্ঞে তাঁর অভূতপূর্ব সাংগঠনিক তৎপরতা, বিরল দূরদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সুষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। নারীকে শুধু লিঙ্গ হিসাবে নয় যথোচিত ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই ঐতিহাসিক দ্বায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের জীবনের যথার্থ রূপ – রস – গন্ধও আস্বাদন করেছেন। আলস্য, ভীরুতা, অজ্ঞানতা ও পরশ্রীকাতরতার দেশে অসাধারণ যুক্তিপরায়ন, দৃঢ় মনোভাবাপন্ন রোকেয়া নারীর দৈন্য ও দুর্গতির উপশম করার চেষ্টা করেছেন, এমনকি মহিলাদের পারস্পরিক আলোচনার জন্য একটি সমিতিও গঠন করেন যার নাম 'আঞ্জুমান – ই খাওয়াতিন ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি। এই সমিতির মধ্য দিয়েই গোটা সমাজের আসল চেহারাটা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হন। 'স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষাদান' ই ছিল এই সমিতির মূল লক্ষ্য। তবে দারিদ্র্য পীড়িত অভাবগ্রস্থ বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পোশাক পরিচ্ছদ দান, বিধবা ও অসহায় নারীদের জীবিকার ব্যবস্থা, কন্যাদায়গ্রস্থ অভিভাবককে সাহায্য করা ছিল সমিতির অভিষ্ট। এছাড়া কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা অভিযান, পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য, শিশুপালন, পরিবেশ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার প্রচার কার্য চালাতো। সুতরাং নারীর সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত অধিকারের প্রশ্নে এই সমিতি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

রোকেয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের শেষ ধাপে 'জীবনের মানে' খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন - 'এ জীবন লইয়া কি করিব? এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়?'

রোকেয়ারও জীবন সম্পর্কে ছিল একই জিজ্ঞাসা। শেষ পর্যন্ত কন্যা রোকেয়া থেকে নারী রোকেয়ায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক

মনোভাবের মধ্য দিয়ে -

'শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুনের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।' (রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ২৭)

রোকেয়ার মধ্যে যে নারী সত্তা এতদিন অবগুন্ঠিত অবস্থায় অনাদরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তাকেই সাদরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সদুত্তরও পেয়েছেন। বিশেষ করে নিজেকে চিনতে পেরেছেন নারী জাগরনের বিস্তারিত কর্মসূচীর মধ্যে। অসহায় জীবনকে নতুনভাবে তাৎপর্যমন্ডিত করেছেন নানাভাবে -

'বুক ঠুকিয়া বল মা - আমরা পশু নই, বল ভগিনী -
আমরা আসবাব নই, বল কন্যে - জড়াউ অলঙ্কার
রূপে সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই, সকলে সমস্বরে
বল, আমরা মানুষ।' (রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ২৯৯)

মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে যে গৃহের প্রয়োজন তা পিতার নয়, স্বামীর নয়, পুত্রের নয় - নারীরই একান্ত নিজস্ব গৃহ, তার নিজের অস্তিত্বের গৃহ। রোকেয়া সেই 'গৃহ' নির্মান করতে পেরেছিলেন বলেই জীবন থেকে আনন্দের রস আস্বাদন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ নারী হতে পেরেছেন।

"রাধা"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাধা ঃ ইতিহাসের মানবিক মুখ

উত্তম পুরকাইত

তারাশঙ্কর মূলত রসবাদী ঔপন্যাসিক, কিন্তু সমস্ত রচনায় শোনা যায় কালের পদধ্বনি। উপন্যাস রচনার দেশকালের সঙ্গে উপন্যাসের পটভূমির দেশকালের যোগসূত্রে এবং এক অপূর্ব জীবনালেখ্যে দু-ধরনের ঔপন্যাসিকতাকে খুঁজে পাওয়া যায় তারাশঙ্কররের পরিণত উপন্যাসগুলিতে। দেশকালের প্রেক্ষাপট আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে উপন্যাসের কাহিনীর অন্তর্গত তত্ত্বে। আত্মদহনের পীড়, প্রত্যাশিত জীবনের ব্যর্থতায় দুঃখবোধের মধ্যে এক শিল্পরসের জাগরণ – এ তাঁর উপন্যাসের কাহিনীকে যে রসগত পরিপূর্ণতা দেয় তার সঙ্গে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উত্থান-পতনের তুমুল আলোড়নে উঠে আসে ঔপন্যাসিকের নাস্তিকতা থেকে অস্তিবাদী বীক্ষা। 'রসকলি', 'কবি'-র মত রসবাদী উপন্যাসগুলিতে তারাশঙ্কর রাঢ়ের বৈষ্ণবীয় প্রেম অথবা স্নিগ্ধ কাম-গন্ধহীন প্রেমের সঙ্গে কাম-মোহিত প্রেমের সমীকরণে জীবন তৃষ্ণার পরিপূর্ণতাকে অঙ্কন করেছেন। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সঙ্গে দেশকালের সংঘাত, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংঘাতে সভ্যতার পালা বদলকে দেখিয়েছেন।

ষাটের দশকের উপন্যাস 'রাধা' আরও পরিণত, ইতিহাস ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মহাকাব্যিক উপন্যাস। ফলে এক ঔপন্যাসিকতা দেয় সুগভীর বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা সংজাত প্রেমের আস্বাদ। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের নিষ্কলুষতা পঙ্কিল হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় পরকীয়া তত্ত্বের বাহক রাধাকে অস্বীকার করে কংসারি কৃষ্ণের আরাধনা ও পরিশেষে সেই কঠোর কৃষ্ণরূপের আঘাতে প্রবৃত্তির পরাজয় হলেও প্রাণের মূল্যের বিনিময়ে রাধাকে স্বীকৃতি জানিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। অপর ঔপন্যাসিকতায় ধরা পড়ে রাঢ়বঙ্গে নবাবী আমলের শৃঙ্খলা আলিবর্দি খাঁ থেকে সুজাউদ্দিন, সফররাজ খাঁ-এই দীর্ঘ ইতিহাসের বিলাসীতায় চূড়ান্ত অপশাসন, বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলা, শাক্ত ও সন্ন্যাসীদের আত্মসংগঠনের পরিবর্তে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মহাভারতের মত রক্তস্নাত যুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যর্থতায় প্রাণ দানের মত নানা ধরনের ফলশ্রুতি। 'রাধা' যদি পরকীয়া সাধনা ও স্বকীয়া সাধনার দ্বন্দ্বে একটি প্রেমের উপন্যাস হত তাহলে ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতির এই দীর্ঘ

পটভূমি ঔপন্যাসিকের সম্ভবত প্রয়োজন হত না। রাঢ়ের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক ভিন্নমাত্রিক মহাকাব্য 'রাধা'।

১৭২০ -' ৬০ অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কয়ক দশকে রাঢ়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে দুর্যোগ ও অন্ধকার নেমে এসেছিল। দিল্লীর শাসন মুক্ত হয়ে নবাবী আমলের সূচনায় মুর্শিদকুলি খাঁর রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পরবর্তী শাসকদের ভোগবিলাসে বঙ্গের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের বহুমুখী যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল। নবাবী আমলের সুফল জনজীবনে শান্তির পরিবর্তে দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলেছিল। প্রবৃত্তির লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে ইতিহাসকে যে পথে ঠেলে দিয়েছে, রাঢ়ের সংস্কৃতিতে তার পচন দেখা গেছে আগেই। মহাপ্রভুর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ভেঙে পড়েছে, সমৃদ্ধ গঞ্জগুলি কলুষিত করেছে সেই মহৎ প্রেমভাবনাকে। ঔপন্যাসিকের বীক্ষণে প্রথম থেকেই ধরা পড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জ্বালিয়ে তোলে প্রবৃত্তির আগুন। মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী শাসককরা সেই প্রবৃত্তির উন্মাদ লীলার বীকার। আবার ইলামবাজার, জনুবাজার, সুখবাজার প্রভৃতি জমজমাট গঞ্জগুলিতে ধনবান বৈষ্ণব মহন্তরও সেই প্রবৃত্তি, উপভোগের শিকার। ইতিহাসের রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বিবরণের পরে দোল যাত্রার কথায় লেখক সেই সর্বনাশের সংকেত পাঠকের সামনে মেলে ধরলেন — "দেশের জীবনের শুধু এইখানটিতে সর্বনাশের সংকেত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনে পচ ধরেছে; একটু অবহিত হলেই তার গন্ধে অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে। কিন্তু সেদিকে অবহিত হবার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতাও নেই কারও।" — ইতিহাস ও সংস্কৃতি একাকার হয়ে আছে উপন্যাসে।

মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম যে জীবনকে সাগর সঙ্গমে পৌঁছে দিয়েছিল, এক মহৎ তীর্থে উপনীত হয়ে সমগ্র বাঙালি পেয়েছিল অমৃতময় শুদ্ধ জীবনের আস্বাদ। সেই প্রেমবিপ্লবে ভেসে গিয়েছিল বড় রিপুর লোভ, অহংকার ও স্বার্থ পরতার, ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার হানাহানি। সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগে, চিত্তের আনন্দময়তায় যে মহৎ-জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল বঙ্গের জনজীবন, ধীরে ধীরে সে পথ মজে এসেছে। অমৃতের স্বাদ ঠেকেছে দেহের পঙ্কে, আত্মার মুক্তিপথ রুদ্ধ হয়ে জীবন হয়েছে মজাবিল। বদ্ধ জলাশয়ে চক্রাকারে একই বৃত্তে আবর্তিত প্রেম সাধনা কোনো সাধনা নয়, ধর্মের আচার- আচরণের মরুতে আচ্ছন্ন অন্ধজীবন ভোগ। বৈষ্ণবধর্মের এই পচন দরিদ্র ভিক্ষুক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আচরণ থেকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ অথবা সদ্য-উদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সংযোগ এই বিকৃতিকে চরমে পৌঁছে দিয়েছিল। এই বিকৃতি থেকে জাতির উদ্ধারক রূপে আবির্ভূত উপন্যাসের নায়ক মাধবানন্দ তাঁর বংশ পরিচয়ে, নিজের অতীত জীবনের সেই কলুষতাকে দেখেছিলেন। এই কলুষতা তাঁর কাছে

আবার ফিরে এসেছে কৃষ্ণদাসীর রূপ ধরে।

নবাবী শাসনে শায়েস্তা হয়েছিল চোর, ডাকাত, দরিদ্র লম্পটরা কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্রোতে যে ধনবান লম্পটদের আবির্ভাব ঘটে তারা যে কোনো সভ্যতার, ইতিহাসের, সংস্কৃতির স্বচ্ছ জীবন-যাপনের সর্বত্র তাদের কলুষিত জীবনভোগের নেশায় ভাঙন ধরিয়ে দিতে পারে। লেখক দেখিয়েছেন সেই স্রোতপ্রবাহে বৈষ্ণবের সাধনায় কিভাবে ধরেছিল ফাটল — "ইলামবাজারে, জনুবাজারে ব্যবসা বাণিজ্যর স্রোত। গঞ্জ উঠল জেঁকে । ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী এল মুর্শিদাবাদে; সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল আবার জাঁকল। ..... স্রোতটা বাইরে থেকে যেমন এল, ভিতর থেকেও তেমনই বন্যার জলের সঙ্গে মেশবার জন্য পুকুরের জলেও স্রোত ধরল। এখানকার দোকানদারও এক পুরুষের মধ্যে মহাজন হয়ে উঠে আমিরী বিলাসে মাতল; যারা সামান্য সাধন ভজন করত তারা হয়ে উঠল সাধক।" — এই পথেই বৈষ্ণবের প্রেমধর্মে নেমে এসেছে পঙ্কিলতা। কৃষ্ণদাসীকে এরাই সাধনার পথ থেকে টেনে কাদায় নামিয়েছে। বৈষ্ণবের পরকীয় তত্ত্বে যে বিকার নেমে এসেছিল, সে বিকার যেন ইতিহাস ও অর্থনৈতিক পালাবদলের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর সর্বব্যাপক প্রভাব পড়েছিল সাধারণ জনজীবনে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঢ়ের সামগ্রিক জীবনে ঘোর অনাচার ব্যথিত করেছিল মাধনানন্দ বা তারাশঙ্করের সততানিষ্ঠ জীবনাদর্শকে।

মাধবানন্দের স্বকীয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার লড়াই বিকৃত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। এই প্রতিকারের ভাবনা প্রবল হয়েছিল বঞ্চিত মায়ের সারা জীবনের বেদনা থেকে। যে বিকৃতি বৈষ্ণবের সাধনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে তা দেশকাল থেকে সমাজ পরিবারেও প্রবেশ করেছিল। পিতৃবংশকে দেখেছে, জমির সনদ পেয়ে জোতদার হয়ে সেই কর্তারা যবনীকে নিয়ে বিলাসের আমিরি ঢঙ পালটে বৈষ্ণবীয় ভজনার মুখোশ পরে ছিল। প্রস্তরীভূত বেদনা নিয়ে মাধবানন্দের মা পুত্রের মনে সংকল্পের মন্দির গড়ে তুলেছিল। সেই সংকল্প "তার মা যাতে বেদনা পেয়েছেন, সারাটা জীবন ম্লানমুখী হয়ে কাটিয়েছেন, তার উচ্ছেদ যে করবেই। ধর্মের নামে জীবনের বিকৃতি প্রবৃত্তির এই ব্যাভিচারকে সে জীবনপাত করে নির্মূল করবে। ... মানুষের জীবনের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়ে চলেছে অসৎ থেকে সতে, অশুদ্ধতা থেকে পরিশুদ্ধতায়। বিকৃত ব্যাখ্যায় অধোমুখী বিপরীতধর্মী করার পাপ কখনো সহ্য করবে না। সমস্ত দেশ সমস্ত জাতি -সব যাবে অনিবার্য ধ্বংসের পথে।" —স্বকীয়া তত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা উঠে এসেছে মাধবানন্দরূপী তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিকতায়। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে বাদ দিলে তাঁর যে প্রতিহারিমূর্তি প্রধান হয়ে ওঠে সেই সাধনাই

স্বকীয়া সাধনা। পরকীয়া সাধনার যে মাধুর্য মহাপ্রভু প্রচার করেছিলেন তা জনসমাজের সর্বত্র তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি। বরং পরকীয়া রাধাকে আশ্রয় করে জনজীবন পঙ্কময় হয়ে উঠেছিল। এই পচন রোধ করতে না পারার কারণেই হিন্দুধর্মও হীনবল হয়ে পড়ে। মাধবানন্দের ভাবনায় ঔপন্যাসিক ইতিহাস ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সংঘাতকে একাকার করেদিয়েছেন — " দোষ সে ঔরঙ্গজীব বাদশা বা হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী বাদশাদের দেয় না। তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসমত কাজ করেছে। ধর্ম বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয় তবে তার ফল ভোগ তারা করবে। কিন্তু হিন্দুর এ দুর্ভোগ তার নিজের জীবনের কর্মফল। এ পাপ থেকে হিন্দুকে উদ্ধার পেতে হবে।" — মাধবানন্দ সত্যের উদ্ধারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সত্য কলঙ্কিনী রাধা নয়, পরিশুদ্ধা রাধা, যাকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন জনজীবনে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, ভিক্টর হুগো, তারাশঙ্করের রচনার মধ্যে এই দেশকালের সত্য আবিস্কারের চেষ্টা দেখা যায়। এই সমস্ত কথাকার এক সত্যনিষ্ঠ আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে রেখে যান।

ঔপন্যাসিক তাঁর ভাবাদর্শ ও বীক্ষাকে রূপ দিয়েছেন নবীন সন্ন্যাসীর কৃষ্ণরূপের আরাধনা ও নতুন গড় নির্মাণ করে হিন্দু ধর্মের আত্মসংগঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। একদিকে নবীন গোঁসাই -এর কাছে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীর প্রেম প্রত্যাশা এবং সংকল্পে দৃঢ় মাধবানন্দ অপরদিকে কেশবানন্দকে নিয়ে অন্যায়ের প্রতিকারে আত্মসংগঠন গড়ে তুলতে চায় এই সন্ন্যাসী। তাঁর জ্ঞান, পুঁথিপাঠ ও ধর্ম উপলব্ধির খ্যাতি পড়েছিল ছড়িয়ে। স্বকীয় তত্ত্বের প্রথম প্রচারক আচার্য কৃষ্ণদেব যখন নিজেই পরকীয়া তত্ত্বে দীক্ষা নেন তখন পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কংসারি আরাধনার গুরু কেউ নয়, মহন্ত মহারাজের কথা স্বীকার করলেও এই আদর্শ তার জীবন দর্শন, তার অন্তর থেকে উঠে এসেছে। তার এই ধর্মবোধের পরম্পরা আছে। পরকীয়া সাধনার মর্মার্থ তা অজানা নয়। পরকীয়া নায়িকার মিলনাগ্রহ, আত্মসমর্পনের গভীরতা, সেই অকূলে ঝাঁপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জানেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী ঈশ্বরের শক্তিরূপিনী লক্ষ্মী স্বামী-প্রেমের ঐশ্বর্য ও সকল গৌরবের অধিকারিনী হয়েও তৃপ্ত হন নি; মনে হয়েছিল এর চেয়েও মধুতম মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্য আনন্দের জন্যই তিনি দাপরে গোকুলে পরকীয়া রাধা হয়েছিলেন। তিনি জানেন, এ ভজনার মাধুর্য পঙ্কোদ্ভূত পঙ্কজের মত সর্বমালিন্য-মুক্ত, এ পুষ্পের মর্ম মধুর-আস্বাদ অমৃততুল্য। তবু তিনি রাধাকে স্বীকার করতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন এই আস্বাদ সাধারণের জন্য নয়। এ অধিকার নিষ্কাম ভক্তের। ঔপন্যাসিক পাশাপাশি দাস-সরকার ও তার

কু-পুত্র অক্রুরের চরিত্রে বুঝিয়ে দেন, যে দেশকালে মাধবানন্দের আবির্ভাব সেখানে নিষ্কাম ভক্তের আরাধনা কল্পনা অকল্পনীয়। অন্যায়ের প্রতিকারে পরকীয়া প্রকৃতিরূপা নারীকে নিয়ে সব অভিজ্ঞান ছেড়ে প্রেমের অভিজ্ঞানে দাঁড়োনো কঠিন। যদুপতি কৃষ্ণও কংসারি রূপধারণ করে রাধাকে ত্যাগ করেছিলেন। রাধাকে স্বীকার করে জনসমাজের মধ্যে প্রতিকার ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ভ্রান্তি প্রবেশ করবে সহজেই। আত্ম সংগঠনে চাই দৃঢ়তা ও সংযমের শুদ্ধতা। এখানে দেশব্রতী, সত্যধর্মের উদ্ধারকরা কঠোর। কৃষ্ণদাসী পাগলিনী হলেও মাধবানন্দ বিচলিত হন না। মাধবানন্দ ন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের যুদ্ধের কথাও বলেন। তবে যখন জানতে পারেন কৃষ্ণদাসী তার জন্য উন্মাদ হয়েছে তখন দুঃখবোধ করেন। মাধবানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক বিশৃঙ্খলার আড়ালে ঢেকে থাকা এক ইতিহাসের নায়ক। জাতির পুনরুদ্ধারের জন্যই ভোগবিলাসের প্রতীক নারীকে তার আত্মসংগঠনের মহৎব্রতে প্রবেশ করতে দিতে চায়নি।

মাধবানন্দ 'রাধা'কে অস্বীকার করে বাংলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহ্য, ধর্মসমন্বয়ের ঐক্য নিয়ে গড়া ইতিহাস থেকে বিচ্যুত হতে চাননি, তাকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কল্যাণ-চৈতন্য জাগাতে চান। বলেন — "মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম আমি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি, সেখানে কোন বিরোধ নেই।" এই ধর্মবোধ থেকে বোঝেন, দেখেন — "সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাড়া আমি দেখেছি, সে সাড়ার মধ্যে হিংসার রক্তচক্ষু দেখেছি, কুটিল আক্রোশের গর্জন শুনেছি।" — তাঁর চোখে ধরা পড়েছে বৈষ্ণবের সাধনার নামে তীব্র দেহভোগের উন্মাদলীলা। এই বিলাসিতা যে জাতিকে গ্রাস করেছে তারা কেউ তাদের পৌরুষ, প্রতিকারের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি। শিবাজীর পর শম্ভুজী সুরা এবং নারীর আসক্তিতে ডুবে বিকৃত হয়ে মুঘল কারাগারে বন্দী হয়ে প্রাণ দিয়েছে। রাজপুতনা ঘুরে দেখেছেন —"এত তেজ, যত বড় বীর্য, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ব্যাভিচারের ব্যাধি।" তাই মীরার রণ ছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ কেঁদেছিলেন। পরকীয়া রাধার বিষক্রিয়ায় জর্জরিত বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা জাতির পুনরুদ্ধার কল্পনা আকাশ কুসুম। মাধবানন্দের ভাবাদর্শের সঙ্গে মিশে আছে লেখকের ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন, সর্বোপরি সততা।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর কালের অনিবার্য আঘাতে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন। সামন্ততন্ত্রের পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে শিবনাথকে, অহীন্দ্র পারেনি কালিন্দীর চরে প্রথম বসবাসকারী সাঁওতালদের রক্ষা করতে। মাধবানন্দ অন্যায়ের প্রতিকারধর্মকে একমাত্র বৈষ্ণবসাধনা করে

ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মহৎ কর্মকাণ্ডে সহযোগীরূপে পেয়েছিলেন কেশবানন্দকে। তবু কেশবানন্দের পথ ও মাধবানন্দের পথ এক নয়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কেশবানন্দ রাজকর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়ে সংসার সম্পত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু "মুঘলবংশের যে শাখাকে সমর্থন করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন — তার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে গেছেন।" — এই কেশবানন্দের রক্তে ছিল প্রতিশোধের স্পৃহা, সর্বস্ব হারানোর জন্য দায়ী বিধর্মীদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টা। এজন্য মাধবানন্দের আত্মসংগঠন নয়, রাজনৈতিব রণকৌশল উচ্চাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার লক্ষ্যে নবাবী আমলের দুর্বলতায় ও সিংহাসন লোভের হানাহানির সুযোগে বৈষ্ণব স্বকীয়, পরকীয় সন্ন্যাসী ও শাক্তেরা যে শক্তি সঞ্চয়ের আয়োজন বিচ্ছিন্নরূপে করে যাচ্ছিল সেই সমস্ত শক্তিকে একত্র করার উদ্দেশ্যে মাধবানন্দকে আশ্রয় করেছে, তার দুঃশ্চিন্তায় ভরসা দিয়েছে। কেশবানন্দের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সরে থাকতে চাইলেও মাধবানন্দ কর্ম স্রোতে ভেসে গেছেন। নাগা সন্ন্যাসীর বেশধারী বর্গীদের চিনতে পেরে মাধবানন্দের প্রতিহারি মূর্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী দেখেছে নবীন গোঁসাই যেন তাদের উদ্ধারক। কিন্তু এই সিদ্ধ পুরুষ অসহায়, বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করেন, কোনো প্রেমলীলায় ধরা দেননা। মাধবানন্দের এই প্রত্যাখ্যান কৃষ্ণদাসী মানতে না পেরে কখনো পাপাবোধের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে কখনো নবীন গোঁসাই-এর অহংকার চূর্ণ করার জন্য মোহিনীকে অক্রুরের হাতে তুলে দেবার শর্ত হিসেবে ইলামবাজারে অক্রুরের হাতে মাধবানন্দের অপমান দেখতে চেয়ে সেই ভয়ংঙ্করতার কথা ভেবে উন্মাদিনী হয়ে গেছে। মোহিনীকে রক্ষা করার অনুরোধ নিয়ে কয়ো উপস্থিত হলে মাধবানন্দ হেতমপুরের হাফেজ খাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েও বিচলিত না হয়ে পারেনি। আবার কেশবানন্দ তাদের সুরক্ষার কথা বললেও "দৃঢ়স্বরে মাধবানন্দ বলে উঠলেন, না। বিশ্বসংসারে পাপ এবং পুণ্য প্রবৃত্তি দুইটি একই শক্তির দুই বিরোধী রূপ। এ বিরোধের মধ্যে সন্ধির মধ্যপথ নেই কেশবানন্দ। পাপকে মরতেই হবে। তার পুণ্য বিলুপ্তির মধ্যেই চৈতন্যস্বরূপের মহাপ্রকাশ সম্পূর্ণ হবে।" — কিন্তু নানা দিক থেকে ঘনিয়ে আসা সংকটে মাধবানন্দ পারেননি কালের হাত থেকে নিজেকে, তাঁর আদর্শকে রক্ষা করতে। তার অনিবার্য পদধ্বনি মাধবানন্দ শুনতে পান —" কালের পদধ্বনি শোনবার সেই ধ্বনি তরঙ্গ অনুভব করার শক্তি বোধ হয় জীব জগতের জন্মগত। নইলে প্যাঁচা শেয়াল এরা ঠিক প্রহরে প্রহরে কী করে ডেকে ওঠে? আমরা মানুষ। ওদের থেকে অনেক জন্ম এগিয়ে আছি। আমাদের পক্ষে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের কোন এক প্রহরের ক্রান্তিমুহূর্ত অনুভব

করা তো অসম্ভব নয় কেশবানন্দ।" — মাধবানন্দের এই আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠল বর্গী আক্রমণের ধ্বংসলীলার সেই ক্রান্তিপর্ব থেকে বাংলাকে উদ্ধার করা মাধবানন্দের পক্ষে সম্ভব হল না।

ঔপনিবেশিক শাসনে প্রবেশের প্রাক্ মুহূর্তে মাধবানন্দের পরাজয়ে বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার পুনরুদ্ধারের অন্তিম প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ঘোষিত হয়। তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেছে। কুরুক্ষেত্রের ইশারা, উদ্যোগ পর্ব শেষ। মাধবানন্দ বিষন্ন, ক্লান্ত। এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা মাধবানন্দকে গ্রাস করে, দেহে কোনো ব্যাধির চিহ্ন নেই, যেন শুধু চৈতন্যের মড়ক। সেই চরম শূন্যতা ও নাস্তিকত্বের অন্ধকার থেকে উঠে আসতে মাধবানন্দ ছুরি হাতে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করে। এই পরাজয়ের কারণ তাঁর অজানা নয়, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আদর্শ প্রতিষ্ঠা পরাজিত হয় ক্ষমতার বৃত্তে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্মগোপন করে থাকে তাকে চিনতে না পারা বা তার হাত থেকে আদর্শকে সরিয়ে রাখতে না পারায়। অধঃপতিত নবাবী শাসন, ধর্মবোধ, সংস্কৃতি ও জীবন-যাপনের কলুষতার বিরুদ্ধে তরবারি হাতে কংসারি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে যে আদর্শ মাথা তুলেতে চেয়েছিল তা কালের হাতেই পরাজিত হয়েছে। বৈষ্ণবের সাধনা যেমন রাধা রূপে কৃষ্ণের মোহন মূর্তির স্বরূপকে বুঝে উঠতে পারে না, কখনো তা মহৎ প্রেমের প্রত্যাশা জাগিয়েও বিকৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়; তেমনি 'রাধা'কে বা লীলারূপকে অস্বীকার করে কৃষ্ণের সংসারি রূপের সাধনাও রহস্যাবৃত্ত থেকে যায় -"সেই নাস্তিক,মানসলোক দর্শন করা সেই বিচিত্র সত্তা আজ বাস্তবে দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে। এক কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনাবৃত্তা রহস্যময়ী - তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু নিদারুণ হতাশার আতঙ্কের মত ঝাপসা - তার আঁচল দিয়ে সব কিছু মুছে দিচ্ছে। দ্যুলোক ভূলোক দুলছে, উল্টে যাচ্ছে"- টলতে টলতে জলে পড়ে গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। "গঙ্গার জলস্রোতের মধ্যে সেই রহস্যময়ী কায়ারূপ ধারণ করেছে- বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন, গতিহীন নাস্তিত্ব"।

নাস্তিকতার মধ্যে থেকে উঠে আসে আদর্শবাদী লেখকের অস্তিত্ববাদী বিশ্বাসের ধ্রুবলোক। মাধবানন্দও পৌঁছে যান অমৃতলোকে- মোহিনীর কাছে। যে মোহিনী বৈষ্ণবের পঙ্কের মধ্যে জন্মেও ইতিহাসের মহাতাণ্ডব যার উপর দিয়ে বহে গেলেও যে তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে সেই মোহিনীই ফিরে এসেছে বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী রূপে। ঔপন্যাসিক বাস্তবের ধ্বংসলীলার তান্ডবের ইতিহাসের সঙ্গে আদর্শ বা বিশ্বাসের স্বপ্নলোক রূপী 'রাধা' কে এভাবে মিলিয়ে দেন। মাধবানন্দ যে 'রাধা'কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা সভ্যতার, বৈষ্ণবের, ইতিহাসের বিকৃতি, আর যে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে তার মৃত্যু তা কুরুক্ষেত্রের

মহাযুদ্ধের পরেও যে স্বপ্ন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি বাঁধতে চায় সেই 'রাধা' বাঁশরীওয়ালী। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-" ঐ বাঁশরীওয়ালীর মোহিনীর সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু- রাধাকে বুকে গ্রহণ করেই। এ রাধা সমাজ, এ রাধা ইতিহাস, এ রাধা সময়- এ রাধা মাধবানন্দকে মুক্তি দেয় বাউলের গানে, স্বপ্নের মিথে। ..... মাধবানন্দর জনসমাজকে উজ্জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে আসে না, আজও দুশো বছর পরেও আসেনি। কবে আসবে? ..... মাধবানন্দর সংগ্রামে-প্রতিরোধে, নাস্তিক্যে, শূন্যতায় আবার মোহিনীর শেষ স্পর্শে নিবিড় মানবিক উত্থানের গল্প — যে গল্প আজও বহমান, যে গল্প আমাদের শুনতেই হয়।" — (উপন্যাস রাজনৈতিক, তারাশঙ্কর)

"ইনফ্যান্ট টেরিবল্"

সুপ্রিয় ধর

"দেশটা ক্রমশ ইতরের দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর কোন সৎ শিল্পীর নিজের দেশকে ইতর বলে দেখানো উচিত নয়, ব্যাপারটা অধার্মিক।" — এরকম স্পষ্ট উচ্চারণ যিনি করতে পারেন তিনি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের "infant terrible", দামাল শিশু, আদতে আপোষহীন দামাল চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক। "Tiger – the Films of Ritwik Ghatak" প্রবন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক Derek Malcolm -এর মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য — "Of all India's many comparatively unsung directors, Ritwik Ghatak (1925-76) was possibly the most obiously talented .... Here, we all felt, was a passionate and intensely national film-maker who scemed to have found his way without much access to the work of others but who was most certainly of international calibre." ঋত্বিকের ভাষায় এই 'ইতরের দেশ'-এর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর শিল্প আমাদের অস্তিত্বের রক্তক্ষরণের ইতিহাস, আমাদের প্রত্যেকের স্বরূপচেনার ও চেনানোর বজ্র নিনাদ। ঋত্বিকের ছবি যেন 'মেঘে ঢাকা তারা'র নায়িকা নীতার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত বেঁচে থাকার আর্তি যা সমগ্র দেশজুড়ে প্রকম্পিত, প্রতিধ্বনিত করে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার।

ঋত্বিক ঘটক মোট আটটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র তৈরী করেছিলেন — 'নাগরিক' (১৯৫২-৫৩), 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা (১৯৬৫), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' (১৯৭৪)। এক বিড়ম্বিত, অস্থির, বিক্ষুব্ধ সময়ে ঋত্বিক তাঁর অসাধারণ ছবিগুলি নির্মাণ করেছিলেন। 'কোমল গান্ধার'এ ভৃগুর বাবার মুখে একটি অনন্য সংলাপ — 'কি নির্মল ছন্দে জীবনটা শুরু করেছিলাম, এই ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া কি উচিৎ?' — এই প্রশ্নটি সম্ভবত আমাদের সকলেরই প্রশ্ন। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নীলকণ্ঠ বাগচীর একটি সংলাপ আমাদের মনে বিঁধে থাকে, অবিরাম ঢেউ তুলতে থাকে, "এভরিথিং ইজ বার্নিং, এভরিথিং উইল বার্ণ"। এই তাহলে ঋত্বিক ঘটক — দেশভাগের যন্ত্রনা, উদ্বাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূল মানুষের জীবনযন্ত্রনা, ভ্রান্ত রাজনীতি, নিয়ম-নীতিহীন সংস্কৃতি — এরকম বিভ্রান্ত, হতাশ পরিবেশের অসহায়তা, হতাশা,অসংলগ্নতা ঋত্বিকের ছবিতে একেবারে নতুন আঙ্গিকে ধরা

আছে। বাংলা চলচ্চিত্রের এক স্বতন্ত্র বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, সচেতন বাচনভঙ্গী যা একান্তভাবেই ঋত্বিক ঘটকেরনিজস্ব তা চলচ্চিত্রের ফ্রেমে ঋত্বিক তৈরী করতে সচেষ্ট থেকেছেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের এই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচেষ্টা সব সময় সফল হয়নি, কিন্তু একেবারে দেশজ আবহাওয়ায় চলচ্চিত্রের মৌলিক ভাষাটাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন একটা ভাষা, চলচ্চিত্রের একটা নতুন medium-এর হদিশ ঋত্বিকের ছবিতেই ভারতীয় দর্শক প্রথম পেলেন। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ফর্ম ভাঙার ইতিহাস। হলিউডের প্রভাব ঋত্বিকের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। সম্পূর্ণ দেশজ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানবিক দলিল ঋত্বিকের ছবি, আর এখানেই ঋত্বিকের ব্যক্তি ও শিল্পীমানসের অনন্যতা। সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু ঋত্বিক ঘটক কোন এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, ...ঋত্বিকের প্রধান গুণ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর মৌলিকতা এবং সেটা সে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল।'

ঋত্বিকের আটটি ছবিতেই হলিউডের প্রভাবমুক্ত চারিত্র্যধর্ম, চলচ্চিত্রের একান্ত নিজস্ব ভাষা, যা ঋত্বিকের চিত্রকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য অম্লান হয়ে আছে। ঋত্বিক তাঁর ছবির জন্য যে বিষয়-বস্তু নির্বাচন করেছিলেন সে রকম বিষয়-বস্তু নিয়ে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় ঋত্বিকের আগে আর কেউ তা ভাববার সাহস পাননি। ঋত্বিকের প্রায় সব ছবিতেই দৃশ্যপরিকল্পনা, রূপকল্পনির্মান, চলচ্চিত্রের আবহসৃষ্টি, ধ্বনি ও সংগীতের অব্যর্থ প্রয়োগ, এবং সর্বোপরি ঋত্বিকের মেজাজ শাসকচেতনা রূপে সক্রিয়। দেশীয় লোকাচার, লোকসংগীত, মিথ্, বিশ্বাস ইত্যাদির উপস্থাপন ও প্রয়োগনৈপুন্যে ঋত্বিক ঘটক একক,এবং অনন্য।

'শিল্পের জন্য শিল্প' — এই শ্লোগানে ঋত্বিক বিশ্বাসী ছিলেন না। নিছক শিল্পচর্চার জন্য ঋত্বিক চলচ্চিত্রের জগতে আসেননি। ঋত্বিকের নিজের ভাষায় : 'আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাবো, ... যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলাবার কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার protest কে যদি আপনার মধ্যে চারিয়ে দিতে পারি, তবে শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।' ছবি করতে আসার উদ্দেশ্যটা যেহেতু পরিস্কার, ফলত ঋত্বিক তাঁর ছবিগুলোতে এমন এক সাবলীল আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে নাটকীয়তা, অতিনাটকীয়তা, আর্কিটাইপ বা মৌল-প্রতীকের ব্যবহার সম্পূর্ণ এক নতুন চিত্রভাষা, নতুন এক প্রতীকী রূপের জন্ম দিয়েছে। ধ্বনি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জটিল, দুঃসাহসী প্রচেষ্টা

ঋত্বিকের ছায়াছবিতে অনুভবশক্তির গভীরতা প্রদান করছে। আর চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার কোন মাত্রায় পৌঁছতে পারে, সংগীতের ব্যবহার একটি ছবিকে কি ধরণের মহাকাব্যিক বিস্তার ও গভীরতা দিতে পারে, সংগীতের অব্যর্থ প্রয়োগ কি ভাবে একটা গোটা দেশের মর্মবিদারক হাহাকারের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, সংগীতের ব্যবহার কি প্রবলভাবে আমাদের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিতে পারে, ঋত্বিক ঘটকের ছবি না দেখলে তা বোধগম্য হয়না। চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার নিয়ে যারা গবেষণা বা পড়াশোনা করতে চাইবেন ঋত্বিকের ছবিগুলো অবশ্যই তাদের আদর্শ।

ঋত্বিকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' ১৯৫২-৫৩ সালে তৈরী হলেও মুক্তি পায় ১৯৭৭ সালে। প্রথম ছবিতে অনেক দুর্বলতার কথা চলচ্চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই প্রথম ছবিতেই বাংলা ছবির সিরিয়াস দর্শকগোষ্ঠী বুঝে গিয়েছিলেন যে অন্যধরনের ফিল্ম করতে এসেছেন নবীন এক পরিচালক যিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে মহাকাব্যিক ধাঁচে ধরার চেষ্টা করছেন। আঙ্গিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে অনেক দুর্বলতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, কিন্তু একটি বেকার জীবনের রুক্ষ, কঠিন সংগ্রাম, আশা-নিরাশা এবং সংঘাত-এর এক বস্তুনিষ্ঠ, মননশীল দলিল 'নাগরিক'। ছবিটি সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ' ঋত্বিকবাবু! ছবিটা সময় মত রিলিজ হলে আপনি প্রথম পথিকৃৎ হতেন।'

ঋত্বিকের সব থেকে সার্থক ছবির তালিকায় আমরা ধরে নিতে পারি 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার'এবং 'সুবর্ণরেখা'। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' একটু ভিন্ন অর্থে উল্লেখযোগ্য 'অযান্ত্রিক' ছবিটিকে বলা যায় অসাধারণ একটি চিত্রধর্মী উপন্যাস। একটি গাড়ী, ঘর্ঘর আওয়াজ করা ভাঙাচোরা একটি গাড়ী যে চলচ্চিত্রের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে তা ঋত্বিকের আগে কেউ ভাবেননি, কোন ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেখাও যায়নি। ছবিটিতে এক ড্রাইভার ও তার একটি পুরানো ট্যাক্সির কথা বলা হয়েছে। গাড়িটি কাছের এবং দূরের যাত্রীদের নিয়ে ভাড়া খাটতো। একেবারে লজঝড়ে ট্যাক্সির মালিক এবং চালকের নাম বিমল। নিঃশঙ্গ বিমল, একক বিমল ট্যাক্সির নাম দিয়েছে 'জগদ্দল' এবং বিমল তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে 'জগদ্দল' কে ভালবাসে। একদিন এক সুন্দরী মহিলা এলেন যাত্রী হিসেবে। কিছুদূর যাওয়ার পর বিমল জানতে পারলো যে মেয়েটি, যুবতী মেয়েটি পরিত্যক্তা, তখন বিমল তাকে বাঁচাতে চাইল, চাইল ভালবাসতে। কিন্তু ভালবাসার অনুভূতিটুকু মেয়েটির কাছে বিমল প্রকাশ করতে পারলো না — মেয়েটি ট্রেনে চড়ে চলে গেল। বিমল

তার প্রিয় ট্যাক্সি 'জগদ্দল'-এ করে ট্রেনটিকে অনুসরণ করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না, গাড়ীটি তখন বিগড়ে বসলো, একেবারেই চললো না। রাগে, বিরক্তি এবং ক্ষোভে বিমল পুরানো লোহা-লক্কড়ের কারবারীর কাছে তার ভাঙাচোরা গাড়ীটিকে বিক্রি করে দিল। এরকম একটি গল্প নিয়ে ঋত্বিকই সম্ভবত ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে প্রথম রুক্ষতা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির মিশ্রণে মনকে নাড়া দেওয়া এরকম একটি ছবি করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

'অযান্ত্রিক' ছবিতে উপনিবেশবাদের হাত ধরে আসা যন্ত্রযুগে ব্যক্তির একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা সংগীত ও শব্দের সুমিত প্রয়োগের ফলে দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে। 'অযান্ত্রিক' ছবিটি যারা দেখেছেন তাদের তো অবশ্যই বিস্মৃত হওয়ার কথা নয় লোকসংগীতের আশ্চর্য, সার্থক প্রয়োগ। আদিবাসীদের নৃত্য-গীত ছবিটিকে ছন্দোময় করে তুলেছে। ঋত্বিক 'অযান্ত্রিক' কে একটি মহৎ কবিতা হিসেবে তৈরী করেছেন। 'জগদ্দল' একটি পুকুরের পারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল আকাশ, চতুর্দিকে এক অলৌকিক নীরবতা — ব্যস্, আর কিছু নয়, তৈরী হয়ে গেলো চলচ্চিত্রের নিজস্ব কবিতা, চলচ্চিত্রের একান্ত নিজস্ব ভাষা। ক্যামেরাকে নানা দৃষ্টিকোন থেকেব্যবহার করা হয়েছে। পরিত্যক্তা মেয়েটি ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমলকে কিছু বলতে চাইলো, বিমলও যেন তার অনুচ্চারিত ভালবাসার কথা বলতে উদ্যোগী হলো, কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে দ্রুত এগোতে শুরু করলো। ঠিক এখানেই ঋত্বিকের একটিঅসাধারণ কাজ আছে। ট্রেন প্লাটফর্ম ছাড়ছে দ্রুত গতিতে, মেয়েটি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে, আর বিমল দ্রুতধাবমান ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, ট্রেনের যান্ত্রিক বিকট আওয়াজে কারোর কোন কথাই শোনা গেলো না। প্লাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলো, একেবারে ফাঁকা প্লাটফর্মে বিমল একা। এরকম একটি দৃশ্য যিনি পরিকল্পনা করতে পারেন, তিনি যে মহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দলভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঋত্বিকের 'মেঘে ঢাকা তারা' একটি খাঁটি ভারতীয় ছবি হয়েও চিরকালীন আবেগ মথিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। দেশভাগ এবং উদ্বাস্তুদের আশা হতাশার আবহ ঋত্বিকের ব্যক্তিগত প্রিয় বিষয়। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় এই বিষয়টিই সঙ্গীত ও ধ্বনির অশ্চর্য সুষম প্রয়োগনৈপুণ্যে দেশীয় সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মানবতার বেঁচে থাকার আকুল আর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশ ভাগের পর ভারতে আগত একটি উদ্বাস্তু পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এক তরুণীর জীবনের বিপর্যয়, ব্যাপক হতাশা, নিষ্ঠুর যন্ত্রনার কাহিনী নিয়ে 'মেঘে ঢাকা তারা'। মেয়েটির জীবনের করুণ পরিণতি, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মেয়েটির

জীবনের যন্ত্রনাদগ্ধ পরিসমাপ্তি — এই ছোট্ট বিষয়টির ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে এই চলচ্চিত্র। ঋত্বিকের প্রতিভার স্পর্শে গল্পটি বিশাল মাত্রা পেয়ে যায়। বৃহত্তর অর্থে আমরা সবাই যে ছিন্নমূল — এই তথ্যটাই ঋত্বিক 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় বলতে চেয়েছেন।

চলচ্চিত্র কথনের প্রচণ্ড শক্তিময়তায় 'মেঘে ঢাকা তারা' -র শেষ দৃশ্যে স্বপ্নভঙ্গের যে হাহাকার ঋত্বিক ধারালো হাতিয়ারের মত নির্মাণ করেন তা এক কথায় অনবদ্য। 'দাদা আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম', — ছবিটির শেষ দৃশ্যে নীতার এই দাবীকে ঋত্বিক শরীরী রূপ দিয়েছেন। নীতার কথাগুলো যেভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, সাউণ্ড ট্র্যাকের অসাধারণ প্রয়োগ, নীতার কান্না — এইসব কিছু মিলে মিশে সৃষ্টির যে তীব্রতা ঋত্বিক তৈরী করেছেন তা আজো পর্যন্ত বিশ্ব চলচ্চিত্রের কোন চলচ্চিত্র নির্মাতা পেরেছেন কিনা তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র শেষের এই দৃশ্যটি এমন কোন দর্শক খুঁজে পাওয়া যাবেনা যাকে বিচলিত করেনি, অভিভূত করেনি। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক নিয়ে ঋত্বিক ছবিটিতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। একটি দৃশ্যের কথা এখানে আমার বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করছি। রিফিউজি কলোনীর বাড়িগুলো যেমন হয়, ঠিক সেরকম একটি বাড়ির বেড়ার দরজার ফাঁক দিয়ে আবছা আলো আসছে, ঘরের ভেতরে নীতা ও তার ভাই শংকর, আলো-আঁধারির মাঝে নীতা এবং শংকরের গলায় ' যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানটি যে এফেক্ট সৃষ্টি করেছিল তা চলচ্চিত্রের ভাষায় অনন্য। এধরনের আলো-আঁধারির পরিবেশ নির্মাণে ঋত্বিক ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় অনেকগুলি নাটকীয় মুহূর্ত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্তই জীবনের কথা বলতে চেয়েছে। মেলোড্রামাকেও ঋত্বিক জীবনের সাথে গ্রথিত করে দিতে পেরেছিলেন। ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন যে, মেলোড্রামাও জীবনের অঙ্গ, তাঁর ফিল্মে তাই মেলোড্রামাকে অত্যন্ত সাবলীলভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে ঋত্বিক পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে একটু অন্যরকম ছবি তরতে চেয়েছেন। একটা সার্বিক ভাঙনের চিত্রায়ন 'সুবর্ণরেখা'। বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে, ঐতিহ্যলালিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে, চতুর্দিকে সর্বব্যাপক ভাঙন । যে মানুষ দুটোর হাত ধরে, যে মানুষ দুজনের উপর বিশ্বাস রেখে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু মানুষরা একটা জায়গায় এসে থিতু হবার চেষ্টা করছিল, তারা বিস্ময় ও বেদনায় লক্ষ্য করলো কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশ্বর, প্রতিবাদী হরপ্রসাদ লড়াই-এর পথ ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে এলো কলকাতা শহরে বুর্জোয়া, ধনতান্ত্রিক সমাজের মজা উপভোগ করতে। আলো ঝলমল রাতের

কলকাতার মোহিনী রূপের সামনে দাঁড়িয়ে হরপ্রসাদের মুখে ঋত্বিক একটি অসাধারণ সংলাপ রেখেছিলেন। হরপ্রসাদের মনে হয়েছিল বুর্জোয়া এই নগরজীবন 'যুদ্ধ দ্যাখে নাই। মন্বন্তর দ্যাখে নাই। দাঙ্গা দ্যাখে নাই। দেশভাগ দ্যাখে নাই'। ছবিটির আরেক জায়গায় হরপ্রসাদ বলছে, 'আসল কথা কি জান ভাইডি ও প্রতিবাদই করো আর লেজ গুটাইয়া পালাইয়াই যাও, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লোপাট, আমরা সব নিরালম্ব, বায়ুভূত।' এ ধরণের সংলাপের মধ্যে একধরণের মহাকাব্যিক বিস্তার রয়েছে যা একান্তই ঋত্বিকের নিজস্ব। ছবিটি সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছিলো যে এটি অবক্ষয়ের ছবি। আদতে কিন্তু তা নয়। ঋত্বিক 'সুবর্ণরেখায়' সমগ্র মানবজাতির পুনর্বাসনের প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিয়েছেন।

'সুবর্ণরেখা'-য় অনেক স্বপ্ন ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। 'সুবর্ণরেখা'-য় অনেক কোয়েন্সিডেন্স ঋত্বিক প্রয়োগ করেছেন, বিদেশী সমালোচকদের চোখে যা মেলোড্রামা তাকেও অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিতে গিয়ে ঋত্বিক ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, শব্দ, ধ্বনি, আবার কখনো পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করেছেন। কলকাতার জরাজীর্ন একটি বস্তির ঘরে রাতের কলকাতার মজা লুটতে গিয়ে জীবন যুদ্ধে পরাজিত, হতাশ ঈশ্বর মত্ত অবস্থায় দেহ সওদা করতে গিয়ে যখন আবিষ্কার করে সে তার বোনের ঘরেই এসে পড়েছে, তার বোন সীতা আত্মহত্যা করে, ফিনকি দিয়ে রক্তের বিন্দু বিন্দু দাগ ঈশ্বরের সাদা পাঞ্জাবীতে লাগে, পরমুহূর্তেই ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে ঈশ্বরের জান্তব কান্না - ওই সব কিছুকেই সমালোচক জর্জ সাঁদুলের মেলোড্রামা মনে হয়েছিল, কিন্তু সিকোয়েন্সটি নির্মাণে ঋত্বিকের অসাধারণ দক্ষতাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের যুক্তি ছিল ঈশ্বর, পৃথিবীর যে প্রান্তে যে কোন মেয়ের ঘরে প্রবেশ করলে বৃহত্তর অর্থে সেই মেয়েটি ঈশ্বরের বোনই হতো। ছবিটি শেষ হয় বাচ্চা ছেলে বিনুর হাত ধরে ঈশ্বর চলেছে সেই দেশের সন্ধানে, নতুন সেই বাসার সন্ধানে যেখানে 'আঁকাবাঁকা নদী, আর দূরে নীল নীল পাহাড়, সেইখানে বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান গায়' — সীতার শৈশব স্বপ্নের সেই দেশে কোনোদিনই পৌঁছানো হয়না, ঈশ্বর আর বিনু চলেছে বুর্জোয়া সভ্যতার বাইরে সেই নিরালা বাসার সন্ধানে।

'সুবর্ণরেখা'-য় ঋত্বিক যে সংলাপ রচনা করেছেন তা অনেকাংশে নাট্যধর্মী। সংলাপের এই নাট্যধর্মিতা 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমলগান্ধার' এও ভীষণভাবে উপস্থিত, এবং ঋত্বিক এটা খুব সচেতনভাবেই করেছেন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত,হতাশ ঈশ্বর যখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত, অদ্ভুত রহস্যময় আলো-

অন্ধকারের একটা পরিবেশে হরপ্রসাদ যখন 'রাত কত হইল? উত্তর মেলে না' সংলাপটি উচ্চারণ করে, ঈশ্বর থমকে যায়, তারপর থেকে হরপ্রসাদের সব সংলাপই নাটকীয়। সংলাপের এই নাট্যধর্মিতা আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়কে টানটান পর্দায় বেঁধে দেয়। ঋত্বিকের ছবিতে, বিশেষত 'মেঘে ঢাকা তারা' ও সুবর্ণরেখা'-য় নাটকীয় সংলাপ ও নাটকীয় মুহূর্ত্ত চাবুকের মত আমাদের নিশ্চল অস্তিত্বের শরীরে আছড়ে পড়ে। 'সুবর্ণরেখা' ছবিটিতে mother archetype এর ব্যবহার সবথেকে বেশী। ছোট্ট মেয়েটি হাততালি দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তার সেই ভীষণ আনন্দের মুহূর্ত্তে তার সামনে এসে দাঁড়ায় বীভৎস কালীমূর্ত্তি। ঋত্বিক সম্ভবত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে গোটা মানব জাতি, তার সভ্যতা ও ভয়ংকর কালীমূর্ত্তির archetypal image -এর সামনে পড়ে গেছে। বিভিন্ন পুরা কাহিনী, লোককথা, পৌরাণিক বিশ্বাস থেকে ঋত্বিক তাঁর ছবির রূপক-রূপকল্প নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় রূপকল্প হলো আদিশক্তি ও মাতৃমূর্ত্তি, আর এইসব কিছুই ঋত্বিকের ছবিতে একটা ধ্রুপদী মেজাজ, ক্লাসিকধর্মিতার আবহ সৃষ্টি করেছে।

'কোমল গান্ধার' ছবিতে দেশভাগের তীব্র বেদনা, গণনাট্য আন্দোলনে যারা সে সময় নেতৃত্বে ছিলেন তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ছবির নায়িকা অনসূয়ার মনের জগতে নিরন্তর ভাঙনের, দ্বিধার বেদনা ও অসহায়তা ঋত্বিকের অনন্য চলচ্চিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। ছবিটিতে প্রতীক এবং সংলাপ দর্শককে অন্যজগতে নিয়ে যায়। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রায়নের মুন্সীয়ানায় নায়িকা অনসূয়া হয়ে ওঠে আমাদের বাংলাদেশের মুখ, সমস্ত ভাঙনকে জুড়তে পারে অনসূয়া, মিলনের পথ তৈরী করতে অনসূয়াই সক্ষম। অনসূয়া বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, ছিন্নমূল অস্তিত্বের বেদনা, দেশভাগের যন্ত্রনা — সব কিছুকেই মেলাতে পারে, এবং অনসূয়া হয়ে ওঠে তাই মিলনের প্রতীক। অবিভক্ত, আবহমান বাংলার প্রতীক অনসূয়া। 'কোমলগান্ধার' তাই মিলনের ছবি।

'কোমল গান্ধার' -এ ভেঙে যাওয়া সবকিছুকে মেলানোর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ছবিটিতে রবীন্দ্রসংগীতের যেমন অব্যর্থ প্রয়োগ আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনি বিভক্ত সব কিছু একটা জায়গায় মিলিত হোক, এই আকুতিকে ধরবার জন্য ঋত্বিক ছবিটিতে অনেক বিয়ের গান ব্যবহার করেন, যে গানগুলি সমগ্র ছবিটিতে আন্তরিক মিলনের আবহ তৈরী করে। "ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পিঁড়ি, মধ্যে সোনা দিয়া, আইজ হইবে সীতার বিয়া", কিম্বা "আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া" — এরকম টুকরো টুকরো গানের কলি, শাঁখ ঘন্টার আওয়াজ, পুরনারীর উলুধ্বনি—এই সব

কিছুই 'কোমলগান্ধার'-এর বক্তব্যকে ধারালো করে। সর্বব্যাপ্ত ভাঙনের মধ্যে মিলনের বাসনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আমাদের বুকে বাজে, অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব একটা নতুন মাত্রা পায় 'কোমলগান্ধার' ছবিটিতে। সত্যজিৎরায়ের ঋত্বিক-মূল্যায়ন একশোভাগ যথার্থ, কেননা সম্পূর্ণ দেশজ পরিবেশে, একান্ত নিজস্ব চলচ্চিত্র-ভাবনায় ঋত্বিক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সমগ্র মানব জাতির শিকড়হীনতার যন্ত্রনাকে যেমন প্রকাশ করেছেন, পাশাপাশি অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতায় মুখ থুবড়ে পড়া বাড়িটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

'তিতাসএকটি নদীর নাম' এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিদুটো ঋত্বিক যখন তৈরী করেন, তখন তিনি ভয়ংকর অসুস্থ, হতাশ, বিভ্রান্ত। কিন্তু ছবিদুটোতে ধ্বংসই শেষ কথা নয়, জীবনের অন্য দিগন্ত, সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ছবি দুটোতে সঙ্গীতের ব্যবহার উল্লেখ্য। 'তিতাস'-এ সঙ্গীত কোন প্রত্যক্ষ চেহারায় প্রকাশ পায়নি, সরোদের শান্ত, সমাহিত, মূর্ছনায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' -এ তিতাসের শান্ত রূপটিকে যেমন ঋত্বিক ধরার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে মালোদের সহজ, সরল জীবনযাত্রা, আদিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ সরোদের সূক্ষ্ম মীড়ের ছোঁয়ায় বিমূর্ত অবস্থাতেও শরীরী রূপ পেয়েছে। ছবিটিতে একটি লৌকিক গানকে ঋত্বিক অব্যর্থ দ্যোতনায় প্রয়োগ করেছেন। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' তে নীলকণ্ঠ বাগচীর গলায়, দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত স্বরে 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখ পানে' রবীন্দ্র সংগীতের অব্যর্থ ব্যবহার ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ক'টি ছবিতেখুঁজে পাওয়া যাবে তা গবেষণার বিষয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এ মালোদের সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও, তিতাসের জল শুকিয়ে যাবার পরেও ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে একটি শিশু মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটতে থাকে। প্রতীকটি জীবনের কথা বলে, জীবনের গান গায়। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে হতাশ, হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠী বাগচী পুলিশের গুলিতে মারা যাবার আগে বলেছিলেন — 'একটা কিছু করতে হবে তো?' — আর মারা যাবার পরে পাশে এসে দাঁড়ায় তার ছেলে 'সত্য', জীবনের পক্ষে 'সত্য' দাঁড়ায়।

শিল্প এক বিশেষ ধরণের নির্লিপ্তি দাবী করে। ঋত্বিক ঘটকের কোন ছবিতেই তা পাওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তি ঋত্বিক বড় বেশী হয়ে প্রতীয়মান হন তার ছবিতে। অনেক ক্ষেত্রে অতি-ব্যবহার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধের অভাব, কোথাও বা আরোপিত ঘটনা বিন্যাস আমাদের চোখকে কিছুটা হলেও পীড়া দেয়। এইসব সামান্য বিচ্যুতি চলচ্চিত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত সব পরিচালকের ছবিতেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সমকালের দুঃসহ পরিবেশের

বিরুদ্ধে আমাদের সুখী, নিশ্চিন্ত জীবনকে যেভাবে ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে নাড়া দিয়েছেন, সজোরে আঘাত করেছেন তা ঋত্বিকের আগে এবং এখনো পর্যন্ত কেউ করতে পেরেছেন বলে জানা নেই। এমন একটি চিত্র কাঠামো ঋত্বিক তৈরী করেছিলেন যা সম্পূর্ণভাবে গতানুগতিক ধারার বিরোধী। ঋত্বিক চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব ভাষা তৈরী করেছেন, ফটোগ্রাফিকে অর্থপূর্ণ আঙ্গিক সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করেছেন, নাট্যধর্মিতা এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিককে একটা সুতোয় গ্রথিত করেছেন। চলচ্চিত্রের সমস্ত রকম আঙ্গিককে ভেঙে চুরে, নানা বিভঙ্গে বিন্যস্ত করে, ঋত্বিক সম্পূর্ণ একটি দেশীয় চলচ্চিত্র শৈলী তৈরী করেছেন, আর এখানেই ঋত্বিক প্রকৃত শিল্পী। 'সুবর্ণরেখা'য় রাতের কলকাতায় হোটেলের দৃশ্যে হরপ্রসাদের উপনিষদ আবৃত্তি যে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে তা অবশ্যই ঋত্বিকের চলচ্চিত্র-ভাষার উজ্জ্বল উদাহরণ। জীবনের একটা চিরন্তন ধারাবাহিকতা ঋত্বিকের সব ছবিতেই প্রবহমান। এই ধারাবাহিকতার স্রোতে নিরন্তর বয়ে চলেছে শিকড়-হীন মানুষের বিষন্ন আবসাদ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-লোকসংস্কৃতি-পুরাণের প্রতীক-পাঁচালী-বিজয়ার গান-বিবাহের গান ইত্যাদির কালচক্র। চলচ্চিত্রের এই বাচনভঙ্গী, দেশজ এই আঙ্গিক ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে হয়ে ওঠে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতীক, এবং এজন্য ঋত্বিককে অতিরিক্ত মননশীলতার দায়ে অভিযুক্ত ও করা হয়েছে, কিন্তু কোনভাবেই তার বিস্ময়কর দুঃসাহসিক স্বকীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

'Cinema and I' নামক গ্রন্থে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। "He was one of the few truly original talents in the cinema this country has produced. Nearly all his films are marked by an intensity of feeling coupled with an imaginative grasp of the technique of film -making. As a creator of powerful images in an epic style he was virtually unsurpassed in Indian cinema. He also had full command over the all-important aspect of editing; long passages abound in his films which are strikingly original in the way they are put together. This is all the more original when one doesn't notice any influence of other schools of film-making on his work. For him Hollywood might not have existed at all. The occasional echo of classicl Soviet cinema is there, but this doesn't prevent him from being in a class by nimself."

— Satyajit Ray

The Inner Eye – Andrew Robinson.

'কোমল গান্ধার' ছবিতে নায়ক ভৃগু অনসূয়াকে বলেছিল, 'ওপারে ঐ

যে দেখা যায় ওখানে আমার দেশ। আমার বাড়ী। আমার মা-বাবা-ভাই-বোন সব কোথায় হারিয়ে গেল। আমার ঠাকুমা বলতেন কবে আমরা আবার নিশ্চিন্দি হবো।' শুধু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষই অস্তিত্বের অসহনীয় বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত, অবসন্ন। সব মানুষই খুঁজে বেড়াচ্ছে 'নিশ্চিন্দি' হওয়ার পথ, কিন্তু ক্লান্ত মানবাত্মার চরম আকূতি সত্ত্বেও 'নিশ্চিন্দি' হওয়া যাচ্ছে না। ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও ঋত্বিক তার ছবিতে বিশ্বমানবাত্মার নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রনাকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। এখানেই ঋত্বিক চিরন্তন, আধুনিক।

বৈদিকযুগে নারীজাতির স্থান

স্বাতী সরকার

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুষের আপন সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে উপলব্ধির ইচ্ছা থেকেই নারীসত্তার উৎপত্তি —

"**আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ**"—

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই একমাত্র ছিলেন, তিনি কামনা করলেন আমার জায়া উৎপন্ন হোক। — এই ঔপনিষদিক বাণী প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির মহিমা সম্বন্ধীয় ভারতীয় ধারাকেই তুলে ধরে। ভারতীয় দর্শনে নারী সৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন, অখণ্ড সত্তার প্রকাশবৈচিত্র্যের রূপায়ণে নারী অপরিহার্য।

বৈদিকযগে সমাজেও নারী জাতির একটি সমুন্নত স্থানই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈদিক সাহিত্যের আদিগ্রন্থ ঋক্‌বেদের মন্ত্রে এবং পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেও সামান্য দুএকটি বিচ্ছিন্ন উক্তি ছাড়া সাধারণভাবে নারীর প্রতি কোন অশ্রদ্ধার ভাব দেখানো হয়নি। আমাদের প্রাচীন আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, যেমন ব্যবহারিক জীবনে, তেমনই ভাবজগতেও পুরুষের সঙ্গে নারীরা সমানাধিকারসম্পন্না। একথা তাঁরা জগতের সামনে ঘোষণা করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না । সেইজন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা তত্ত্বদ্রষ্ট্রী ও ব্রহ্মবিদুষী বহু নারীর সাক্ষাত পাই যাঁদের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। বিশ্ববারা, রোমশা, লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপালা প্রভৃতি দিব্যভাব সম্পন্না নারীঋষিগণের দৃষ্ট সূক্ত পুরুষঋষিদের দৃষ্ট সূক্তের সঙ্গে একসঙ্গেসংকলিত হয়েছে।

শুধুমাত্র অধ্যাত্ম সাধনায় নয়, সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করতেন। বিশেষতঃ ঋক্‌বেদের মন্ত্রের নানা উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, সেইসময় নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচ্ছন্দ চারিণী ছিলেন। পিতৃতন্ত্রিক সমাজে পুত্র সন্তানের জন্ম বংশধারাকে অবলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে কন্যাসন্তানের জন্ম অবাঞ্ছনীয় ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, শিক্ষিত পুত্রের মত শিক্ষিত কন্যাও পিতামাতার নিকট একান্তকাম্য ছিল। ঋক্‌বেদোত্তর বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য কখনও কখনও নারীর সম্বন্ধে দু'একটি অশ্রদ্ধাসূচক উক্তি পাওয়া যায় কিন্তু তার থেকে সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা করাও উচিত নয়।

নারীগণের শিক্ষালাভ বিষয়ে বৈদিকযুগের প্রাথমিক পর্বে বিশেষ কোন বিধিনিষেধ ছিল না বলেই মনে হয়। বৈদিক সমাজে সকলশ্রেণীর জনগণের মধ্যে নারীশিক্ষার সমাদর ছিল কিনা সে কথা সঠিক বলা যায় না। তবে উচ্চশ্রেণীর আর্যগণ যে নারীশিক্ষা বিষয়ে পক্ষপাতী ও উৎসাহী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নারীরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চরণ করতে পারত এবং সেকারণেই তাদের উপনয়নবিধি পুরুষের ন্যায় অবশ্য কর্তব্য ছিল। উপনয়নের পর 'দ্বিজ' হয়ে রমনীগণ ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করতেন, পবিত্র অগ্নি আধান করে হোম করতেন এবং বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থপাঠ করতেন। শিক্ষারম্ভ করে তাঁরা সাধারণত ষোল-সতেরো বৎসর পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন। এরপর তাঁদের বিবাহ হোত। বাল্য বিবাহের কথা ঋকবেদে উল্লেখ নেই। নারীগণের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকলেও যজুর্বেদ বা অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্যাবস্থা যথাযথ ভাবে যাপন করে রমনীগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। পতি নির্বাচনের বিষয়ে ঋকবেদীয় সমাজে নারীদের কিছু স্বাধীনতা ছিল।

"স্বয়ং সা মিত্রং বৃনুতে জনে চিৎ" — ঋক্‌বেদীয় এই মন্ত্রটি এ বিষয়ে প্রমান স্বরূপ। অবাঞ্ছিত জামাতার ক্ষেত্রে কন্যাপণ দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মনোরঞ্জনের কথা পাওয়া যায়। আবার কন্যার কোনো শারীরিক ত্রুটির ক্ষেত্রে বরপণ বা যৌতুক দেবার রীতিও ছিল বলে মনে হয়। নারীদের বিবাহ আবশ্যক ছিল না। পিতৃগৃহে বাসকালে কুমারী কন্যার উল্লেখও ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অবিবাহিতা কন্যা আবার পিতার সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে সে শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে। নারীদের বহুবিবাহ ও একাধিক পতিগ্রহণের অধিকার প্রথম দিকে ঋক্‌বেদের যুগে থাকলেও পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা লুপ্ত হয়। পুরুষেরা বহুবিবাহ করলেও বৈদিক সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শও উচ্চই ছিল বলে মনে হয়। গৃহে উভয়েই সুখে শান্তিতে যৌথ জীবনযাপন করতেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

বিবাহের যে মন্ত্রগুলি ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় সেগুলি থেকে বিবাহ বন্ধনের গভীরতা ও পবিত্রতা যেমন অনুমিত হয়, তেমনই গৃহে ও সমাজে নারীর স্থান সম্মানীয় ছিল বোঝা যায়। দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে নববধূর আচরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধীয় বিষয় বিধৃত আছে। গৃহিনীরূপে রমনীরা অনেক দায়িত্ব বহন করতেন। ঋক্‌বেদের মন্ত্রে উপমার সাহায্যে রমনীর এই পারিবারিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে — "গৃহিনী যেমন জাগরিত হয়ে সকলকে জাগরিত করেন, উষাও জগৎজনকে তেমনি জাগরিত করেন।"

শুধু পারিবারিক জীবনে স্ত্রী কর্তৃত্ব করতেন তাই নয়, ধর্মচরণের ক্ষেত্রেও তাঁর অধিকার ছিল। ঋক্‌বেদীয় মন্ত্রে সপত্নীক যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রধান যজ্ঞে 'পত্নীসংযাজ' নামে একটি যাগ অনুষ্ঠিত হত। এতে যজমান পত্নীকে অংশ গ্রহণ করতে হত এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র তাঁর পঠনীয় ছিল।

সহমরণ প্রথা ঋক্‌বেদীয় সমাজে প্রচলিত ছিল না — একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ঋক্‌বেদের কোথাও সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার উল্লেখ নেই। বরং বিধবাদেরও যে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার এবং সমাজ বাঁচাতে তাদেরও যে দায়িত্ব আছে তা বৈদিক ঋষি সদ্যবিধবাদের বোঝাতেন। পরবর্তীকালে সমাজিক অবস্থার বিবর্তনের ফলেই হোক, বা আর্যবহির্ভূত অন্য কোন সভ্যতার প্রভাবেই হোক, সহমরণ প্রথার উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের সময় এই কুপ্রথার প্রচলন না থাকায় বিধবা রমনীদের বেঁচে থাকার কোন অসুবিধা ছিল না। অনেক সময় তাঁরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা দেবরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। তবে দেবর ছাড়াও অন্যকে বিবাহ করার অধিকারও সম্ভবত ছিল। দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শের পাশাপাশি বৈদিক সমাজে পতিতাবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। বিপথগামিনী নারী সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয়া ছিল। অথচ কুমারীর গর্ভজাত সন্তান আপন কর্ম ও মনীষার দ্বারা সমাজে বিশিষ্ট পদবী লাভ করেছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

বৈদিকযুগে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না বলেই নির্দিষ্ট কয়েক বছর শিক্ষালাভে রমনীদের কোনো বাধা ছিল না। ষোল-সতেরো বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করে যাঁরা বিবাহ করতেন তাঁদের 'সদ্যোদ্বধূ' বলা হত। তাঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর নারীবিদ্যার্থিনী ছিলেন যাঁরা আরও অধিকদিন অবিবাহিতা থেকে শিক্ষালাভ করতেন। তাঁদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হত। এঁরা অনেকসময় সারা জীবনও অবিবাহিতা থাকতেন। বৈদিকভারতের নারীরা জ্ঞানচর্চা ছাড়া প্রকাশ্যে অধ্যাপনার কাজ করতেন। পরবর্তী সংস্কৃত ব্যাকরণে 'উপাধ্যায়' পদের স্ত্রী লিঙ্গ হিসাবে 'উপাধ্যায়ানী' ও 'উপাধ্যায়া' এদুটি পদ পাওয়া যায়। 'উপাধ্যায়ানী' পদের অর্থ হল উপাধ্যায়ের স্ত্রী। এর সঙ্গে অধ্যাপনার সংযোগ ছিল না। কিন্তু যে নারী স্বয়ং অধ্যাপনা করতেন তাঁদের বলে ' উপাধ্যায়া'।

জ্ঞান চর্চার এই অবাধ স্বাধীনতার জন্যই বৈদিকযুগে রমনীদের অনেকেই শিক্ষায় সমুন্নত হয়ে জ্ঞানীগুণীদের অগ্রগণ্যা হয়েছিলেন। মন্ত্ররচয়িত্রী নারীঋষিদের কথাও জানা যায়। উপনিষদের যুগেও এমন বিদুষী নারীর কথা জানা যায় যিনি প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী এরকম একজন প্রথিতা নারীঋষি। মিথিলারাজ জনকের সভায় বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিদ্যাবিষয়ক বিতর্কে ব্যাপৃতা হন। বিতর্কে উভয়েই অপরাজিত হন এবং দুজনেই সমান পারদর্শীরূপে বিবেচিত হন। বৃহদারণ্যক গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ীর আখ্যান পাওয়া যায় যিনি পার্থিব সম্পদ অবহেলা করে অমৃতত্বলাভের জন্য উৎসুক হন।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্" — মৈত্রেয়ীর এই বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসা তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসারই পরিচায়ক। এই দুজন ছাড়া সুলভা, বড়বা, প্রাথিতেয়ী প্রভৃতি আরও কয়েকজন নারীর নাম জ্ঞানী সমাজে উচ্চারিত হওয়ার জন্য চিরস্মরণীয়।

বৈদিক শিক্ষা ছাড়া নানাবিধ ললিতকলাতেও বৈদিক যুগের নারীদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা জানা যায়। সঙ্গীত ও নৃত্য এই উভয়বিধ কলাবিদ্যায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার থাকলেও নারীরা বিশেষ করে কলাবিদ্যা শিক্ষা করতেন বলে মনে হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে দেবতারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সৃষ্টি করে তা সর্বপ্রথম বাগ্‌দেবীকেই শিক্ষা দেন। সুতার সাহায্যে সেলাই করা, পশমের বস্ত্রবোনা, বস্ত্রালংকরণ প্রভৃতি কাজে নারীরা নৈপুন্য দেখাতেন। আবার তুলা থেকে সুতা তৈরী, বস্ত্রাদি ও সুতা রং করা, ঝুড়ি, রজ্জু প্রভৃতি তৈরী করা, নানবিধ সুগন্ধী প্রস্তুতিতে নারীরাই অগ্রণী ছিল। বৈদিক যুগে মুদ্গলিনী, বিশ্বপলা, শশীয়সী প্রভৃতি যোদ্ধা রমনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন আলোচনা থেকে মনে হয় পুরুষ প্রধান সমাজ হলেও বৈদিক সমাজে নারীজাতির স্থান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তবে বৈদিক যুগের প্রথমেই ঋক্‌বেদাদি গ্রন্থে নারীর যে স্বতন্ত্র ও উন্নত ভূমিকা আমরা দেখি তা যে বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি ঋক্‌বেদেও কোথাও কোথাও নারী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়।

"ইন্দ্রশ্চিদ্ধা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ
উতো অহ ক্রতুং রঘুম্।।" — অর্থাৎ ইন্দ্র প্রকৃতই বলেছেন, নারীর মন অশাস্য; তার ক্রতু অর্থাৎ জ্ঞান লঘু কিংবা, "ন বৈ স্ত্রৈনানি সখ্যানি সন্তি / সালাবৃকানাং হৃদয়ান্যেতা"।— অর্থাৎ "স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না; স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের ন্যায়।"

তাছাড়া পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে, আদর্শ বিষয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন তার সবটাই যে সর্বাংশে মানা হত তা

নয়। তবে ঋক্‌বেদের সময় সমাজে জটিলতা নিঃসন্দেহে কম ছিল, আর সেই কারণে যুক্তিহীন আচারের প্রাবল্য তখনও বিচারের বোধকে আচ্ছন্ন করে নি। সেই সঙ্গে ঋক্‌বেদের ঋষিদের জীবন সম্পর্কিত সুস্থ সবল দৃষ্টিভঙ্গী নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দানে অকুণ্ঠিত ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যজুর্বেদের সময়ে নারী সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের আধিপত্য, সর্বোপরি অনার্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ — এসব মিলে সমাজে যে পরিবর্তন আসছিল তার প্রভাব নারীজাতির উপর পড়েছিল। তাদের শিক্ষার অধিকার সংকুচিত হয়ে যায়; বিবাহই তাদের জীবনে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে সূক্তগ্রন্থের আহুতিপ্রদান পূর্বক স্ত্রীজাতির হোম করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঋক্‌বেদের পরবর্তী সময়ে সমাজের দৃষ্টিতে নারীজাতির মর্যাদা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। "কন্যা অভিশাপ" "নারী মিথ্যাচারিনী" ইত্যাদি নারীর পক্ষে অবমাননাকর উক্তিগুলি ঋক্‌বেদোত্তর বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। পুরুষ প্রধান পরিবারভিত্তিক সমাজে এভাবে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অথর্ববেদে সপত্নী বিনাশ সূত্ত বা প্রতিষ্ঠাপনসূক্ত অর্থাৎ পলাতকা নারীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা কোনো প্রচলিত সমাজিক প্রথারই প্রতিফলন। কিন্তু এরই মধ্যে গার্গী বা মৈত্রেয়ীর মত কোন কোন নারী গৌরবে-মহিমায়-বিদ্যাবত্তায় সকল বিধিনিষেধকে অতিক্রম করে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাঁরা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। আর এই ব্যতিক্রমীরাই তো যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

Social Science

A Journey Into The Dark Cavern Of The Mind

Dr. Aditi Bhattacharya

"Midway upon the journey of our life
I found that I was in a dusky wood ;
For the right path, whence I had strayed, was lost.
Ah me! How hard a thing it is to tell
The wilderness of that rough and savage place,
The very thought of which brings back my fear!
So bitter was it, death is little more so ;
But that the good I found there may be told,
I will describe the other things I saw."

Sigmund Freud remembered the above lines from the opening of canto 1 of Dantes' Inferno when he first discovered the power of the unconscious – the dark cavern of the mind. For centuries before Freud, Philosophers, biologists, noveltists and Poets recognized that mental activities of various kinds occur without awareness — we are not always conscious of everything that happens in our mental world — there is something underlying our conscious mind, which we can refer as unconscious mind, However, the nature and structure of the unconscious mind, its mode of operation and role of its illness were left for Freud to explain.

Freud was born in 1856 in a Jew family. The family came from Freiberg in Moravia to Vienna in the year 1860. Freud started his profession as a medical student in Vienna Medical College in the year 1873. He thought it was the best way to get a thorough scientific training for probably they had the greatest Medical Faculty in Europe. After five years of medical study Freud was working full time in Professor Brucke's Institute of Physiology, who was one of the founders of modern Physiology. In 1877 he completed four pieces of original research and published papers on them. At the age of twenty one Freud's papers on a method for anatomical preparation of the nervous systen aroused interset in the academic world.

As an ardent researcher Freud joined the Psychriatic Department of the Hospital under Professor Theodor Meynert, the neuroanatomist whose marvellous work on brain anatomy

earned him the title "father of the architecture of the brain." He believed that the cortex of the brain is the seat of all personality building functions and declared that all emotional disturbances and mental confusions are caused by physical illness. Though appreciating Meynert's skill and knowledge in brain anatomy Freud couldn't agree with his observation on mental illness. He could not share Meynert's thought that behind every mental distrubance there is a physical cause. In Meynert's psychriatic department the lunatics were treated with sedative drugs to pacify their mental tensions, electrical therapy and other massages were applied and hot bath on one day and cold bath on the other were prescribed to give them relief from their emotional disburbance. Sometimes the patients were cured but only to come back after a few months or years. Professor Meynert used to say he never saw a lunatic cured. The incredible sufferings of the mental patients made Sigmund gloomy. He spent many sleepless nights to find out where lay the remedy — what were the hidden causes of the abnormal behaviour of those poor helpless fellows.

Freud's research on brain anatomy continued. He discovered some new methods for the study of the course of nerve fibres in the central nervous system. His methods were welcomed and appreciated by the renowned professors of anatomy. Prof. Bruke was elated by the findings of Sigmund's experiments and appreciated him greatly. All his studies and researches had a particular goal, i.e, to unveil the root cause of mental illness. At this period an interesting incident took place which urged Freud thinking with a new vigour that the cause of mental aberrations are not somatic, i.e, physical. A thirty three years old young attractive woman was suffering numbness from her waist and couldn't move her legs for a few months. She was under the treatment of Dr. Joseph Pollok who was a colleague of Freud in the psychriatic Department. One morning Pollok invited Freud to visit the female ward for observing an experiment of a new drug on that woman. Pollok told the woman that he had just completed tests on a new drug which could produce a movement of her legs within sixty seconds, but the drug was extremely dangerous which might cause her death. He suggested the woman she could choose between the alternatives — either to be cured by the new drug

Some of them remained loyal to him throughout their lives, some departed and started new line of thinking – but whether with him or not with him, all of them felt from the core of their heart that they had come across one of the bravest men of the world who had courageously carried on his journey through an unknown and dangerous region where no one before him had dared to step into.

Reference : **Passions of the mind, Irving Stone.**
Encyyclopedia of philosophy, Arthur Pap
Psychoanalytic theory, sigmund Freud.

Women's Emancipation and Krishnabhabini

DR.JAYASHREE SARKAR

"Women are only created for men, and their life has no other meaning except this , is an inhuman and derogatory notion , creating a dangerous and great hindrance on the path of their achieving knowledge and equal rights in this world."[1] - this is what Krishnabhabini Das, believer in women's emancipation, had witnessed Thus, her life's mission was tuned to that end of getting rid of the notion and upholding the cause of women.

Krishnabhabini was born in a remote village in 1864 in a prosperous, traditional Hindu family of Murshidabad (Bengal). Though her father used to teach her at elementary level, her education, in the real sense of the term, only began with her marriage to Devendranath Das, at a tender age of ten. An ideal marital, companionship was beginning to grow but soon Devendranath left for England in 1876 to slt for the Civil Service Examination. But as he had crossed the upper age-limit, his drean remained unfulfilled. When he decided to return to England again, after visiting his ailing father in Calcutta in 1882, Krishnabhabini made up her mind to accompany her husband, leabing her six year old daughter, Tilottama, at the care of the child's grandfather, Srinath Das, a practicing lawyer of the Calcutta High Court and a close friend of social reformer and humanist, Vidyasagar. In 1882, she started her journey for England.[2]

Her travelogue, "England-e Bangamahila" (in Bengali) came out in August 1885. It is not only a detailed chronological account of her voyage, but an analytical essay of the English socicty especially, hihglighting the position of women and family norms, system of education, political set-up and economic condition, religious beliefs seen through the eyes of the newly educated middle-class of Bengal. She also made a comparative study between the condition of her fellow Bengali sisters and emancipated existence of the English women. Her stay in England for nearly a decade (1882-1890) had a role in transforming her personality In the ninetecnth centery, crossing

the seas (kalapani) invited social stigma. Thus Krishnabhabini's journey to England signifies not only leaving the country but a housewife, belonging to a traditional family, out-stepping her domestic sonfines as well as ignoring the social codes of behaviour expected from a young wife. So, in this way, for a woman so long remaining behind the purdah, the words travel' and emancipation' become identical[3].

She recollects in her travelogue that from her childhood, she had a wish to visit Europe Due to her insetiable curiosity, she could not hold her patience when it came to her knowledge that someone had returned from England. But at the same time, she used to console herself that being a Bengali woman, her dreams would remain unfulfilled. While in England, she used to consult the British Museum Library and other libraries. To become an ideal wife of an cnlightened husband was her goal besides satisfying her thirst for unknown. Acquaintancc with people of a totally diffcrent culture and a minute observation of their ways of life had a positive effect in widening her mental horizon. In England, Devendrnath took up tesehing position in three colleges meant for the training of Indian civilians and simultaneously published essays in journals on Vedic and ancient poetry, literature, philosophy, medical scicncc, grammar, mathematics, astronomy and others.[4] In her journey she put a hat like the contemporary European women though she admitted that she felt uneasy.[5] She considered the existence of the Bengali women as 'captivated' who were blind to the developnents and had no power to assist others. Only she, after much trouble was ableto break. 'cage' to enlighten herself. So she asked her fellow sisters in Bengal to break the shackles that had enchained them within the domestic four walls.[6] She diagnosed the cause of the sad plight of her fellow sisters in Bengal "The primary cause of our sad condition is that we are not aware of our faults but when we realize, we do not try to rectify them." To her, remedy lay in interacting with people of different culture and to secept the good qualities of other people.[7] She was a minute observer of the English society especially the English women whose ideals of self-depcndency fascinated her- "Even the unmarried girls too, feel inferior by sitting idly in their parents' home and feel ashamed by remaining

as a burden on relatives. From the very childhood, they learn the notion of self-reliance."[8] She praised the English women for being efficient, clever and learned. Besides, efficiently managing the domestic affairs, they were conscious of their duties and used to assist men in their work- a rare picture in her own country.[9] The English parents also did not show any attitude of discrimination among boys and girls. As such girls conssider themselves equal to boys in every respect.[10] She appreciated the custom of marriage in the **English society where pre-marital courtship among adult** men and women was followed by elaborate marriage rituals in the church. The parents were also relieved of their trouble of finding suitable partners for their children.[11] She compared this with the practice of the custom of child-marriage. prevalent in India which was one of the reasons for premature ageing among her countrymen. She did not notice healthy conjugal relationchip anong the husband and wife in most cases of Hindu marriage. The wife, confined within the domestic four walls, had no idea of how her husband was passing the day and vice versa.[12] She expressed that the Hindu women always possessed courage and vitality but as they were dprived of education and liberty, they could not give a proof of those qualities. The neglect shown by men and the superstitions present in the society were the cause of women's degradation and all the vices.[13] She tried to unveil the real cause of wmen's degraded position and here, she put before her readers the psyche of the Indian men- "The Indian men were afraid of emancipating the women because the latter would not be able to control themselves after remaining in a captive state for a long time which had made their mind weak and sapped their vitality."[14] But she offered a solution that if the Indian women were not set in the path of freedom gradually, then they would never acquire the quality of self-restraint. The men would also find that the emancipated Hindu wmen were in no way inferior to English wmen.[15] While in England, she witnessed the suffragist movement led by the English wmen. Perhaps that occurred to her to be a powerful means to put forward women's cause- "If Bengali women could appeal to every Indian in the way the English women were trying and creating trouble to acquire the power to elect members of Parliament, then probably the Bengali men would pay heed to the pains the Bengali wonen were enduring."[16] She addressed her fellow

sisters as 'bhagini' and asked them how long they would continue their captive existence. If or which they were totally unaware of the developments outside their domestic four walls. As they had not tasted liberty, they seemed to be quite satisfied wiyh their state of living. Though she had managed to break the shackles, she was not happy as long as her Bengali sisters were shedding tears in their captive existence.[17]

She appreciated the English society but criticized their materialistic outlook. As such, she was not a blind admirer "The social system that is suitable for the Europeans does not go with the Indians." Not a western yardstick but reform of the society from within. The necessary ingredients for this task are to be sought from the different regions of India as such.[18] In the real sense of the term, she was not a revolutionary and stood in the midway between traditional and modern thinking. But she held that women however emancipated their status might be, their place of work should be their home. For this every woman should know how to make her family happy and gain expertise in household work.[19] Though she considered household work, cooking, rearing of children and sewing exclusively women's work,but they should never be looked upon as primary task of women.[20] She advocated equal status for both men and women - "When women and men will equally assist each other in every work..and share all the rights and duties...then only human beings will enjoy eternal bliss in their mortal life."[21] She questioned the society's looking upon women as goddesses and thus in a conscious way evading the problem of ameliorating the condition of women- "Whenever the question arises for reforming the condition of Hindu wmen and giving them equal status with men, many people put forward the proof of the status of 'Devi' (goddess) as in the Shastras (religious scriptures). But in real life, do we find nay respect for these devi's ?"[22]

To her, women's emancipation was synonymous with the idea of self-reliance. In the last decade of the nineteenth century, Bengali women expressed their concern for self - dependence and stressed the need for women's united effort to uplift their own condition and Krishnabhabini was not different - "I have decided to guide women in their respective work according to my capacity. Come, all Bengali women, married or widows, I

want to work with you."[23] He held that women should be allowed every kind of education and entry in all types of work. Otherwise, their level of intelligence would not be raised and working - power would suffer. In a critical situation, due to death of the husband or father, a woman with her education in terms of self-reliance could support herself as well as her children financially. This would also restrain her from choosing an immoral path in case she was devoid of such an education.[24] A women should also exist f or herself. Her individual existence should be given importance and reckoned with – 'women in this world....are not created to serve others only nor are meamt to become playful objects at the hands of men. A woman's mission is to live for herself besides living and helping others"[25] But at the threshhold of the new century, her hopes seemed to be disappearing - "...sometime back, I have noticed. that the ways of living of our womenfolk have begun moving backwards."[26]

By the first decade of the twentieth century, Bengali women were in need of an all - India organization, run by women,, to deal, with women's problems and the Bharat-Stree - Mahamandal, founded by Saraladevi Chaudhurani in 1910, emerged as such an organization, catering to the needs of women as well as the country... Besides organizing "Home Education for Indian women in a manner suited to the condition and circumstances," it put great emphasis on providing depots and other facilities for bringing handiworks of Indian women into the market and thereby encouraging them to engage in productive work for the benefit of themselves and households. For the sale of handicrafts made by the destitute widows. A store was opened at Maniktolla area in North Calcutta called Puranari- Nirvaha- Bhandar,' managed by the housewives.[27] Krishnabhabini actively engaged herself in the philanthropic activities of the Mahamandal's Calcutta branch. Her essay entitled 'Bharat- Srree- Nahamandal,' the organization's activities in Calcutta after two years of its establishment could be known. She wrote that in the beginning about six lady teachers were engaged in the programme of imparting education to sixteen adult women in the zenana scheme of education. Later the number of lady teachers increased to twenty under whom about one hundred twenty married women had enrolled themselves.[28]

While in England, she receivad the news of her nine-year-old daughter's marriage at the initiative of her grandefather. Utter misery fell on the little girl's life even after returning from abroad, Krishnabhabini was not allowed to see her daughter in her in-law's place. The daughter returned to her mother only before her premature death. In her advanced years, in 1909, Krishnabhabini had to endure quietly the death of her husband and daughter, within a month.[29]

Sarojkumari Devi, one of her co - workers in the Mahamandal reminisced how Krishnabhabini used to take the burden of visiting households to influenee the members to enroll their women and popularize the mission of the Mahamandal. She took upon the task of, rehabilitation of the widows and young women who had gone astray. Sarojkumari recollected Krishnabhabini many a times used to lament that as she failed to fulfill her duties towards her daughter, her sufferings knew no bounds. Her daugther's death filled her with such a remorsc that she tried to find solace in such social work of ameliorating the condition of unfortunate, young women. She could, at least, console herself that her efforts had been successful in making the life of some women meaningful.[30] After the death of her husband, Krishnabhabini observed strictly the rituals of widowhood which had a great influence on her thoughts and writings. Strict observance of ntuals retrained her to some extent her efforts of meking her 'unfortunate sisters' modern.While conducting the affairs of the Widows's Home, she was naturally concerned with duties of widows and the concept of 'brahmacharyya' (cetebacy).[31] Her message towards the widows for their moral upliftment was in tune with the traditional thinkig attached to widowhood, of sclf- less service towards others and observing strict rules of celibacy. Only this state of living, she considered, could give a widow peace and happiness.[32] The voice that had once upheld the rights of women and protested against the social practices acquired a calm note. She made a comparison between the unmarried, English women and the Hindu widows. To her, if the Hindu widows who had neither family ties or nor duties towards husband or children, if trained properly, could devote themselves like the unmarried women of the West in social work.[33] But as

has been observed that such a depressing end was inevitable in other women besides Krishnabhabini.

Krishnabhabini's vision of emancipation of women began with many promises but she had to compromise with what lay stored in her fate. At the dusk of her life, she searched for the realization of 'emancipation' but in a different way.

REFERENCE:

1. Krishnabhabini Das, 'Streelok O Purush,' Bharati O Balak, Feb-Mar 1890.
2. Aruna Chattopadhyay, 'Editorial,' Krishnabhabini Das-er Nirbachita Prabandha, Calcutta, 2004; Simonti Sen, 'Introduction,' Englande Bangamahila, Calcutta 1996.
3. Simonti Sen, Ibid; Ghulam Murshid, Nari Pargati: Adhunikatar Abhighate Bangaramani, Calcutta 2001, pp66.67
4. Krishnabhabini Das, Englande Bangamahila, Calcutta 1996, (Reprint), p.5.
   Simonti Sem, Ibid, Introduction, p.twentynine.
5. Krishhnabhabini Das, ibid, p.6.
6. Ibid, p.82.
7. Ibid, p.37.
8. Ibid, p.56.
9. Ibid, pp.73,74.
10. Ibid, p.75.
11. Ibid, Ch.XII 'Engreji Vivaha O Garhasthya Jeevan'.
12. Ibid, p.95.
13. Ibid, p.78.
14. Ibid, p.80.
15. Ibid
16. Ibid, p.152
17. Ibid, p.83.
18. Krishnabhabini Das, 'Samaj O Samaj- Sanskar' Bharati O Balak, Dec 1890-Jan 1891.

19. Krishnabhabini Das. 'Streelokcr Kaaj O Kajer Mahatmya', Bharati O Balak, Aug- Sept 1891.
20. Ibid.
21. Krishnabhabini Das, 'Streclok O Purush', Bharati O Balak, Feb-Mar 1890.
22. Krishnabhabini Das, 'Amader Hobe Ki, Sahitya, Oct-Nov 1890- Feb-Mar 1891.
23. Krishnabhabini Das, 'Kaaj O Kajer Mahatmya', op. cit.
24. Krishnabhabini Das, 'Streelok O Purush', Bharati O Balak, Feb-Mar 1890.
25. Krishnabhabini Das, 'Shikshita Narir Prativad-er Uttar', Sahitya, Jan-Feb 1892.
26. Krishnabhabini Das, 'Swadhin O Paradhin Narijeevan', Pradip, Feb-Mar 1898
27. The Modern Review, Oct 1911; Mahila Sept 1911, Nov 1912.
28. Krishnabhabini Das, 'Bharat-Stree-Mahamandal', Mahila, Oct- Nov 1912.
29. Kshemonkari Devi, 'Krishnabhabini- Smritisabhay', Pravasi, May-Jun 1922.
30. Sarojkumari Devi, 'Krishnabhabini Das', Bharati, Nov- Dec 1922.
31. Simonti Sen, 'Introduction', op.cit. p.twenty six.
32. Krishnabhabini Das, 'Vidhabar Kaaj O Brahmacharyya', Pravasi, Jan-Feb 1912.
33. Ibid.

Impact Of Tourism In A Religious Town – Haridwar

Arup Saha

Haridwar – As a brief

In this modern world, there are several beautiful and holy cities in various countries. But India is most fortunately beautified by the city of Haridwar – Kingdom of Gods is obtainable through this 'Door of Gods' (Haridwar). Haridwar is not only the 'Door of Gods' but also the Gate Way to Paradise. From this gateway not only Himalayas begin but also people can go to heaven after having achived spritual salvation. Geographically, the great plains of Ganges begin downward from Haridwar which is entrance towards god and goddesses

Haridwar is a town as well as a district head quarter of Haridwar district, Uttrakhand, India. The town Haridwar spreads between the Shiwalik Mountain range in the North & North-east and Ganges river in the south. It occupies a position of latitude as 29°58′N & longitude as 78°10′E.

Uttranchal the 'land of celestial beauty' became the 27th state of the Indian Union on the 9th Nov, 2000, it has further taken a new name Uttrakhand -2007. It is divided into two parts – Garhwal in the West and Kumaon in the East. Haridwar is located within the Garhwals. Haridwar is one of the Sacred Cities of India and lies in the foot hill of shiwalik range. It is located on the right bank of Ganga. According to a mythological legend, Prince Bhagirath performed penance here to salvage the souls of his ancestors who had perished due to saint Kapil's curse. Bhagirath was blessed and the holy river descended on the earth and its water revived the sons of King Sagara. Following the tradition of Bhagirath, devoted Hindus stands in the Sacred water here and pray for the solvation of their ancestors. Haridwar is also famous for the Kumbha and Ardha Kumbha Mela that held once in every 12 and 6 years respectively.

Haridwar – city of Ghats

Haridwar is well known as the city of Ghats. At least seven popular and holy ghats are there. The most Sacred ghat is Har-Ki-Pauri, built by King Vikramaditya in memory of his brother Bhatrihari.

It also known as Brahmakund and is the beautiful site for Kumbha mela. The evening, Ganga Arti provides a truly enchanting experience as large numbers of Ornate oil lamps – Diyas. Kushavarta Ghat, Subhas Ghat, Gan Ghat, Vishnu Ghat are also the famous Ghats here.

Haridwar – City of Temples

Group of temples and shrines stands in Har - Ki- Pauri and all over Haridwar. The ancient temple is dedicated to Goddess Mayadevi. Manasadevi temple is perched atop the Bilwa parvat. Chandidevi temple is set atop the Neel Parvat. Both the temples can be accessed by ropeways. Bholagiri temple and Ashram at Birla Ghat, Bilkeshwara Mahadeva temple are the other famous temples in Haridwar. Gurukunj Kangri University, Sapt Rishi Ashram & Sapt Sarovar, Kankhal, are the other famous tourist spots situated at the surroundings of Haridwar.

Tourist Profile

Sporadic travels by the nomads in ancient time has now become the world's most flourished industry namely "Tourism". Now it is known as a flourishing Industry. As a religious tourist spot, tourists come here from all over India. It's the place where river Ganges descends to the plain. The Gateway of Gods – Haridwar is also known as "Mayapuri", "Gangadwari", "Mokhsdwari in the ancient Hindu Scripture and epics. The tourist came here to fulfill their religions faith as well as purely tourism like leisure, recreation, pleasure etc. Most of the tourist come from West Bengal, Rajasthan and Uttarpradesh. But the response is very poor from Northeast. Maximum are from urban areas,i.e 72% and 28% from rural areas.

April to November is the peak time for tourist inflow in Haridwar. Tourists come here from all over the India and World throughout the year. According to Haridwar Municipality, tourist arrive in 2003, 2004 and 2005 is 56.2 lakhs, 62.9 lakhs & 75.3 lakhs respectively. There is higher tourist influx during summer as this season makes the begining of "Char Dham Yatra". Except Haridwar the tourist are frequent in Rishikesh, Kankhal & Prayag.

Tourist come from different parts of India with different purpose. Mainly four puposes are well observed, i.e pilgrim,

travelling & sight seeing, leisure and travelling & pilgrim both. Most of the tourists come for travelling & pilgrim purpose. Only pilgrim purpose stands in second. Tourists from West Bengal are the majority for travelling & sight seeing. But if we consider only pilgrim, majority goes to Uttarpradesh & Rajasthan.

Impact f Tourism In Haridwar

As an industry tourism affects Haridwar's environment. By this environment, we mean socio economic, environment, infrastructural environment and physical environment.

Socio-Economic effect :

The money spent by the tourist becomes income for the local people in one form, and is again re-spent or saved. Thus the money orginally spent by the tourist may by spent many times again. Thus more the money changes hands and the more times it is been spent, the greater its impact on economy. Economy further effects on social well being.

In Haridwar, the tourists spend money for – i] Fooding ii] Lodging iii] Transport iv] loundry v] Telecomunication vi] Amusement vii] retail purchasing viii] Professional services ix] Photography x] Guide x] Panda etc.

The local people as well as the people from out side Haridwar are economically benifited, because they are involved with such business. So, in general, the local economy of Haridwar is benifited through tourism. In the peak time of tourist flow, i.e April to November, is also the peak season for business and also for people who are involved with tourism industry in Haridwar, like hotel, photography, resturent, ponda etc. In Haridwar tourism is the big service industry and could have a significant effect on labour. 56% of service sector like garment shop, travel agency etc. have more than one employer. About 20% have 6-9 employer. The average salary of them is Rs 3000 per month. From the survey among the hotel owners, resturent owners, photographers, vechicles owners (only tourism purpose), business men (in Haridwar market), it is seen that most of them earn Rs.<10000/month, i.e 52%, only 2% earn Rs>50000/month. The 'G' value of lorenz curve is 0.44 that indicates the very low level of economic instability among them. Except main business (which linked with tourism) only 20% of them have any side profession and most

of the income, i.e 90% comes from the main business. More than 82% people (who are linked with tourism industry in Haridwar) are satisfied with their income from tourism sector.

Today the development activites are being carried out by all the nations for upliment of lives of their people. As an industry, tourism also takes part in this purpose and of course this is seen in Haridwar. Economic condition of the people of tourism sector has been mentioned earlier. Here another measurement – Human Development Index (H.D.I) also measures the socio-economic condition or develomment of the people or their family who are directly or indirectly related with tourism in Haridwar. *Elucidating the concept of Human Development, UNDP Human* Development Report (1997) described it as the process of widening people's choice and level of well being. There are mainly four goal posts to measure H.D.I and these are – a. Life expectionery b. adult literacy c. Gross enrolment d. GDP per capita. From the field survey in Haridwar, the H.D.I. trends for selected sector (and their family also) of tourism industry has been prepared. The picture of H.D.I trends is very promising here. The H.D.I value of the Hawker is 0.60; it is 0.80 of the hotel owners; 0.75 of the permanent shop owners. It varies between 0.70 -0.76 of the vehicles owner, travel agencies and guides. Over all H.D.I is 0.73. This average H.D.I is more than India's H.D.I, i.e 0.59. It is also said that tourism helps such development because more than 90% of total income of the people (who are connected with tourism) comes from the tourism sector and maximum of them are satisfied with their earning from this sector.

Accommodation and infrastructure :

Tourism requires good and decent accommodation facilities, in other words, accommodation facilities constitute a vital and fundamental part of the tourism supply. Accommodation facilities lead to economic development, social contract and commercial activities. In Haridwar many Hotels, resturant and other accommodation are available. Road connectivity - accesibility, police protection, tourist information system, supply of water, electricity are well here. Abut half of the tourists are pleased with the accommodation and infrustructure. Local people are also benifited from these infrustructrue.

Environmental Impact :

As an industry tourism has its economic, socio-cultural and environmental aspects. It helps a country or a region to earn valuable foreign exchange as well as economic benifits. But we know that all the action has its same and opposite reaction. Haridwar is not an exception. Tourism of Haridwar has caused irreversible damages to this place. Mountains, River Ganga, Wild life, social environmnt are affected by tourism in Haridwar. Air pollution, water pollution, sound pollution have become the order of the day.

The work to measure the environmental impact or pollution is not based on laboratorical examination. It is based on the people's view (who are linked with tourism as well as local people). From the survey, it is seen that, heavy pressure of tourists and other people make Haridwar dusty and polluted and it is most common on any festivals like 'Dashera', 'Baishakhi', 'Kumbhamela' etc. 50% of the respondents said that vehicle movement affects environment and air pollution at day is very common by heavy traffic. 40% of them remarked negetive with population congestion in Haridwar. They said that, it makes Haridwar a dirty and stench city. The local people said that tourism affects on drainage, sanitation, drinking water and garbage negetively. There is a bad impact on land price. 100% people's opine that land price has become very high due to tourism. The main problems here due to tourism are garbage, Ganga-pollution and traffic. Ganga pollution in Haridwar is a burning problem in this context. Maximum pollution occurs due to throwing down of garbage and sewerage system. Immersion bone ash, flower and hair thrown in Ganga also pollutes the Gangas.

Conclusion

Haridwar is one of the seven Sacred cities of India. The sacred Ghats, holy temples, many sight seeing spots attract tourist to Haridwar. Tourism at Haridwar helps to grow local economy. But heavy tourist flow reacts negetivly on physical and cultural environmental here. If there are proper planning, Haridwar can be the ideal tourist spot for all.

Science

Feynman's Approach to Quantum Electrodynamics

By

Dr. Gautam Kumar Mallik

The electrons of an atom move according to the laws of quantum mechanics (QM) established in 1925 and the next following years. For the hydrogen atom, the calculation of the motion of the electron in the electric field of the nucleus was so accurate that 20 years elapsed until any error of the theory could be found experimentally. In 1947 when Lamb and his collaborator Rutherford discovered that some energy levels of hydrogen which should coincide theoretically were in fact somewhat shifted relative to each other.

One important result of the work of Nobel Prize (1965) winners Richard Feynman, Sinitiro Tomonaga, Julian Schwinger was the explanation of the Lamb-shift. Their work is, however, of deep general significance to physics. It has explained and also predicted several important phenomena. They investigated to find the general quantum mechanical laws according to which the atoms and in particular the electrons give rise to electromagnetic (EM) fields, e.g. emit light, and are influenced by such fields. By applying QM not only to matter but also to the EM field Dirac, Heisenberg, and Pauli managed in the 1920's to formulate a theory, called quantum electrodynamics (QED), which contains the quantum mechanical laws for the interaction of charged particles, in particular electrons, and the EM field. It satisfies the important condition of being in agreement with the theory or relativity.

It was soon realized, however, that this theory had serious defects. When one tried to calculate a quantity of such importance as the contribution to the mass of an electron originating in its interaction with the EM field an infinite and therefore useless result was obtained. A similar difficulty occurred for the charge of the electron. Because of the fundamental importance of having a more useful QED many theoretical physicists tried during the 1930's to over come those difficulties.

In the 1940's a new formulation of QED was initiated by

investigations first performed by Tomonaga. His work was primarily related to the demands imposed by the theory of relativity. As soon as Tomonaga knew about the Lamb experiment and Bethe's paper he realized that an essential step to be taken was to substitute the experimental mass for the fictive mechanical mass which appeared in the equations of QED and to perform a similar renormalization of the electric charge. The compensating terms which had then to be introduced in the equations should cancel the infinities. Tomonaga managed to carry out this difficult program on the basis of his earlier investigations mentioned above. He deduced further a correct formula for the Lamb-shift which was found to give results in good agreement with the measurements. Tomonaga and Schwinger was rewarded their independent path-breaking work on the renormalization theory of QED.

Feynman based on his own formulation of a consistent QED, free of meaningless infinities, upon the work in his doctoral thesis of 1942 at Princeton University. His new approach to quantum theory made use of the Principle of Least Action and led to methods for the very accurate calculation of quantum electromagnetic processes, as confirmed by experiment. These methods rely on the famous "Feynman diagram," derived originally from the path integrals. Applied first to QED, the diagrams and the renormalization procedure based upon them also play a major role in other quantum field theories, including quantum gravity and the current "Standard Model" of elementary particle physics.

The path-integral and diagrammatic methods of Feynman are important general techniques of mathematical physics that have many applications other than quantum field theories: atomic and molecular scattering, condensed matter physics, nuclear physics, statistical mechanics, quantum liquids and solids, Brownian motion, noise, etc [1]. In addition to its usefulness in these diverse fields of physics, the path -integral approach brings a new fundamental understanding of quantum theory. Dirac, in his transformation theory, demonstrated the complementarity of two seemingly different formulations: the matrix mechanics of Heisenberg, Born, and Jordan and the wave mechanics of de Broglie and Schrodinger. Feynman's independent path-integral theory sheds new light on Dirac's operators and Schrodinger's wave functions, and inspires

some novel approaches to the still somewhat mysterious interpretation of quantum theory. Feynman liked to emphasize the value of approaching old problems in a new way, even if they were to be no immediate practical benefit.

Early ideas on EM fields

While an undergraduate at Massachusetts Institutes of Technology (MIT), Feynman devoted much thought to EM interactions, especially the self-interaction of a charge with its own field, which predicted that a point-like electron would have an infinite mass. This unfortunate result could be avoided in classical physics, either by not calculating the mass, or by giving the theoretical electron an extended structure; the latter choice makes for some difficulties in relativistic physics.

Neither of these solutions are possible in QED, however, because the extended electron gives rise to non-local interaction and the infinite point-like mass inevitably contaminates other effects, such as atomic energy level differences, when calculated to high accuracy. While at MIT, Feynman thought that he had found a simple solution to this problem: Why not assume that the electron does not experience any interaction with its own EM field? When he began his graduate study at Princeton University, he carried this idea with him.

The Wheeler-Feynman theory

Feynman asked his future thesis adviser, the young Assistant Professor John Wheeler, for help. In particular, he asked whether it was possible to consider that two charges interact in such a way that the second charge, accelerated by absorbing the radiation emitted by the first charge, itself emits radiation that reacts upon the first. Wheeler pointed out that there would be such an effect but, delayed by the time required for light to pass between the two particles, it could not be the force of radiation reaction, which is instantaneous; also the force would be much too weak. What Feynman had suggested was not radiation reaction, but the reflection of light!

However, Wheeler did offer a possible way out of the difficulty. First, one could assume that radiation always takes place in a totally absorbing universe, like a room with the blinds drawn. Second, although the principle of causality states that

all observable effects take place at a time later than the cause, Maxwell's equiations for the EM field possess a radiative solution other than that normally adopted, which is delayed in time by the finite velocity of light. In addition, there is a solution whose effects are advanced in time by the same amount. A linear combination of retarded and advanced solutions can also be used, and Wheeler asked Feynman to investigate whether some suitable combination in an absorbing universe would provide the required observed instantaneous radiative reaction?

Feynman worked out Wheeler's suggestion and found that, indeed , a mixture of one-half advanced and one-half retarded interaction in an absorbing universe would exactly mimic the result of a radiative reaction due to the electron's own field emitting purely retarded radiation. The advanced part of the interaction would stimulate a response in the electrons of the absorber, and their effect at the source (summed over the whole absorber) would arrive at just the right time and in the right strength to give the required radiation reaction force, without assuming any direct interaction of the electron with its own radiation field. Furthermore, no apparent violation of the principle of causality arises from the use of advanced radiation. Wheeler and Feynman further explored this beautiful theory in articles published in 1945 and 1949 [2]. In the first of these articles, no less than four different proofs are presented of the important result concerning the radiative reaction.

Quantizing the Wheeler-Feynman theory: The Principle of Least Action in Quantum Mechanics

To treat a classical system of interacting particles, there are available analytic methods using generalized coordinates, developed by Hamilton and Lagrange, corresponding canonical transformations, and the principle of least action[3]. Feynman always refers to Dirac's classical treatise for the usual formulation of quantum mechanics[4]. The original forms of QM, due to Heisenberg, Schrodinger, and Dirac, made use of the Hamiltonian approach and its consequences, especially Poisson brackets. To quantize the EM field it was represented, by Fourier transformation, as a superpositon of plane waves having transverse, longitudinal, and time-like polarizations. A given field was represented as mathematically equivalent to a

collection of harmonic oscillators. A system of interacting particles was then described by a Hamiltonian function of three terms representing respectively the particles, the field, and their interaction. Quantization consisted of regarding these terms as Hamiltonian operators, the field's Hamiltonian describing a suitable infinite set of quantized harmonic oscillators. The combination of longitudinal and time-like oscillators was shown to provide the (instantaneous) Coulomb interaction of the particles, while the transverse oscillators were equivalent to photons. This approach adopted by Heisenberg and Pauli (1929) was based upon Bohr's correspondence principle.

However, no method based upon the Hamiltonian could be used for the Wheeler-Feynman theory, either classically or quantum mechanically. The principal reason was the use of half-advanced and half-retarded interaction. The Hamiltonian method describes and keeps track of the state of the system of particles and fields at a given time. In the new theory, there are no field variables, and every radiative process depends on contributions from the future as well as from the past! One is forced to view the entire process from start to finish. The only existing classical approach of this kind for particles makes use of the principle of least action, and Feynman developed and generalized this approach so that it could be used to formulate the Wheeler-Feynman theory (a theory possessing an action, but without a Hamiltonian). Feynman was successful to find a method to quantize the new theory[5]. He adopted the overall space-time approach that characterizes the quantization[6] carried out in his thesis and in so much of his subsequent work throughout his career, as he explained in his Nobel Lecture[7].

Reference

[1] R.P. Feynman and A.R. Hibbs, "Quantum Mechanics and Path Integrals" (McGraw-Hill, Massachusetts, 1965). Also see M.C. Gutzwiller, "Resource Letter ICQM-1: The Interplay Between Classical and Quantum Mechanics," Am J. Phys. 66 (1998) pp. 304-24; items 71-73 and 158 - 168 deal with path integrals.

[2] L.M. Brown (ed.),"Selected Papers of Richard Feynman, with Commentary" (World Scientific, Singapore, 2000) pp.

35-59 and pp. 60-68. This volume (thereafter referred to as SP) includes a complete bibliography of Feynman's work.

[3] W. Yourgrau and S. Mandelstam, "Variational Principles in Dynamics and Quantum Theory" (Saunders, Philadelphia, 3rd edn., 1968) give an excellent analytic historical account.

[4] P.A.M. Dirac, "The Principles of Quantum Mechanics," (Oxford university Press, Oxford, 2nd edn. 1935) Later editions contain very similar material regarding the fundamental aspects to which Feynman refers.

[5] S.S. Schweber, "QED and The Man Who Made It: Dyson, Feynman, Schwinger, and Tomonaga (Princeton University Press, Princeton, 1994), especiallly pp. 389-397.

[6] R.P. Feynman, "Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics," Rev. Mod. Phys. 2D (1948) pp. 367-387. Also in SP, pp. 177-197.

[7] "The development of space-time view of QED, "SP, pp. 9-32, especially p. 16.

Not them, Blame their Chemistry!

Dr. Pratiti Ghosh

Happiness is not an abstract concept but a tangible feeling that pervades life with emotions like enthusiasm, excitement, joy and pleasure. Unconditional happiness means "Even little things make you happy and big problems don't knock you over".

Today most people display certain mild symptoms that mirror the more severe symptoms of the mentally disturbed. Cutting-edge brain research knows little about applying their ideas to healing "normal neurosis."

Brain imaging studies have shown that commonly prescribed antidepressants called selective serotonin uptake inhibitors like *Prozac, Zoloft* and *Paxil* tend to calm the overactive emotional areas of the brain associated with depression but they also decrease activity in the prefrontal cortex giving rise to concentration and motivational problems. Overactive limbic system is also related to depression and negativity. Dopamine and serotonin are normally feel-good hormones. Endorphins, released during exercise are also good for over all well-being.

After forty, good health is not automatic. People join a multi-step program and succeed in giving up an addiction, but often only to be replaced by another. For a happy and holistic life, a better brain is required which is manageable by things like diet, exercise, stress management and romance. Being more connected to the people in life heals the brain. Love is as powerful as drugs: in a relationship there is normally three years of free good romantic hormones. Correct brain chemistry provides relaxation and endless energy as is obtained from yogasanas too.

When the brain chemistry is off, one 'rosogollah' is never enough. So a nutrient dense breakfast is required. Activated amino acid supplements are required for establishing correct brain chemistry balance – to increase energy, stabilize mood and improve mental capacity. To obtain full benefit of oral supplementation, good liver and efficient digestive system is also required. It is necessary to drink lots of water, enzyme

supplements, minerals and *aloe vera* to cleanse the liver Vitamin B_{12} is needed for synthesis of dopamine and serotonin, deficiency of which leads to depression. Men and women process amino acids very differently. Men synthesize serotonin 52% faster and can store twice as well, compared to women, thus rarely showing deficiency. In women, serotonin deficiency is the cause of food cravings, depression, etc. The "good girl" behaviour is correlated with low levels of serotonin which leads to over responsiveness to needs of others. She keeps giving till the end with expectation to get back, which she doesn't, nor does she fetch time for herself, ultimately leading to hatred or resentment towards people around her.

Brain produces serotonin most efficiently for the two hours after sunrise – so it is most important for women to get up early. With increased serotonin, the patient experiences calmness, comfort and fulfillment. With adequate levels her need to discuss issues is cut down dramatically as she feels good and happy discussing with others. Carbohydrate based diet (banana) & exercise can overcome this problem. *Prozac* also cures depression, letting in the experience of calmness, comfort and fulfillment.

On the other hand, men need to go to bed early as dopamine is produced for next day two hours before midnight. These are the peak times of production. Men require some risk, challenge and competition to produce little dopamine. Eye contact is a definite indication of normal levels of dopamine as is available during the dating period but gradually declines with monotonous marriage. Dopamine motivates a man to find a solution rather than dwell on it. Too much fat or carbohydrate will inhibit dopamine production but protein rich diet is helpful in this process. Without enough exercise our Basal Metabolic Rate slows and we store fat to be overweight. But too much exercise inhibits fat burning, blocks dopamine production and block prefrontal activity of the cortex. So, athletes usually have lower grades in academics.

With very low levels of dopamine, a man comes really strong in the beginning but his interest cannot last. He is very impulsive due to an under active *prefrontal cortex*. He considers only one problem at a time and gets frustrated or irritated if disturbed then. He is bored with most normal life experiences.

He is normally so inconsistent that 'he can't live with them and can't live without them.' Getting to know another and living in a routine can kill his passion. He is usually unresponsive to the needs of others despite their love and sincerity. Common addictive behaviors are alcohol, cigarettes, sugar, coffee, overworking, oversleeping, focusing too much on sex and pornography.

With deficiency of the neurotransmitter dopamine, children seek immediate gratification, lose interest very quickly, don't listen or consider others' needs, are restless, hyperactive, etc. Increase in it via *Ritalin*, reverses the person. He experiences a surge in clarity, pleasure, energy and motivation. Limbic system is related to emotional tone, its over activity is correlated to depression and negativity.

90% of the millions of children afflicted with Attention Deficit Disorder (ADD) or Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are boys with low levels of dopamine. The syndrome shows up in different ways for different people because people have such a range of temperaments.

With low dopamine levels a man is much more eager to please but only in the beginning of a relationship. Work easily stimulates dopamine but marriage doesn't. While listening to a man trying to share his feelings, he may rapidly lose his ability to focus. At times of conflict he finds it more difficult to take time-out to consider a problem. When a woman begins to complain, the man will pull out an even longer list. If he had sufficient dopamine, he would have tried finding a solution rather than dwelling in a problem. When a woman just wants him to listen for 20 minutes, he will suddenly want to pull out a solution, not the one she is wanting. Incidentally, women with high serotonin levels have very little need to discuss problems with men.

Dopamine deficiency affects memory. He normally remembers only those things that promote production of dopamine, like important business call or pressing problem at work. He is bored with normal life experiences – he needs excess stimulation. Autonomy stimulates production of dopamine and it is associated with production of high level of testosterone.

Low serotonin is linked with overactive cingulate system which is related to safety and security and the ability to adapt

to changes. It also creates an urgency to do things now, not later! With this inflexibility it is hard to be happy with what we get in life. As men have high levels of serotonin they are not automatically motivated to give. Giving without expectations is a luxury for those who already have high levels of serotonin. By expecting too much from a relationship she unknowingly sabotages the romance. But unless a woman asks for more, a man assumes that she is getting what she wants. Yet, by giving too much a woman can block a man from giving more. So she needs to give less and appreciate more what he gives.

Serotonin is responsible for comfort, satisfaction, contentment, happiness, relaxation and optimism, without which she will not be happy with any romance or talking. When a wife or daughter needs food a man has to get it right away, as she experiences temporary amnesia with low blood sugar levels and sudden mood changes are dramatic leaving her feel abandoned and hopeless.

A woman is designed to be more vulnerable and sensitive. When a woman remembers being hurt, eight times more blood flows into the limbic system than man. A balance of giving and receiving provides fulfillment, giving without expectation produces maximum serotonin, as has been predescribed in the Bhagwatgeeta. Overwhelming is linked to low serotonin levels. Women with incorrect brain chemistry take too much time to think what others are thinking having less time to think of own self. Her charity level is like cancelling a vacation but ever complaining about it.

Every frustrating behavior of man to a woman is his low dopamine levels, as is low serotonin level true in case of woman. The pineal gland is responsible for production of serotonin during the day and melatonin (dopamine) hormone at night, without which it is difficult to get a good night's sleep. So humans should discover what they want, enjoy, be less obsessed and more happy. With more serotonin she can prioritize needs and put balance in her life. With increased dopamine he can experience a surge in clarity, pleasure, energy and motivation.

With this, they can give positive message of appreciation, acceptance and trust to spouse that will stimulate production of good hormones so that both can continue giving their best.

Changing Perspectives in Biodiversity Conservation

Dr. Supatra Sen

"Oh Earth! Pleasant be thy hills, snow-clad mountains and forests;
Oh numerous coloured, firm and protected Earth! On this earth I stand, undefeated, unslain, unhurt."

The fiercest battles in human history are fought over the issue concerning the human dimensions of **Biodiversity Conservation**. On an abstract level this entails the wide range of relationships between **human-beings** and **nature** while on a more practical level this concerns the issue of how to deal with the local inhabitants living in and around protected areas and rare or threatened flora and fauna. Driven by the crisis, scientific research on human-environmental interactions developed into a new branch of **Sustainability Science** based on the recognition that the well-being of human society is closely related to the well-being of natural ecosystems. Sustainability Science seeks to comprehend the fundamental character of interactions between nature and society, specifically the interaction of global processes with the ecological and social characteristics of particular sectors and regions.

Management of natural resources takes into consideration the plurality of knowledge systems. Application of scientific research and local knowledge contributes both to the equity, opportunity, security and empowerment of local communities, as well as the sustainability of the natural resources. Local knowledge helps in scenario analysis, data collection, management planning, designing of the adaptive strategies to learn and get feedback and institutional support to put policies into practice while scientific research provides new technologies and helps in the improvement of existing ones. It also provides tools for networking, storing, visualizing and analyzing information, as well as project long-term trends so that efficient solutions to complex problems can be obtained. Various scholars have written about the origin of Protected Areas and their prominence as vehicles of preservation. Among other influences, the eighteenth and nineteenth century English

'**enclosure**' movement, early German concerns with forest conservation and the American westward expansion influenced the evolution of Protected Areas as restricted zones. Local people were often moved and excluded from Protected Areas, with enforcement of exclusion often carried out through 'fences and fines', creating what now is commonly referred to as '**fortress conservation.**'

Top-down fortress conservation has been the preferred conservation strategy and practice for much of the twentieth century, surviving decolonization and upheavals in the political scenario. However, changes from colonial to post-independence governments led to the erosion of political acceptability of and support for exclusionary measures. The concept of **Community Conservation** came forth from this new international development climate, triggering substantive changes for the management of Protected Areas. From the 1970s onwards, it became clear that the top-down preservationist management approach had to be supplanted by a more **bottom-up, inclusive** and **participatory sustainable-use** narrative. The key point about such strategies is that their specific characteristics and influence vary greatly over the concerned time, place and people involved.

The **community-based conservation** (CBC) policy asserts that it is possible and preferable to strike a balance between the needs of local people and the conservation of nature. This is challenged by voices advocating the protectionist approach of '**fortress conservation**' with people separated from certain landscapes because they are inherently incompatible. Importantly no single theory or approach has been absolutely dominant or has been implemented completely. In fact, different narratives, models and approaches are constantly overlapping and competing, which makes the boundaries among them fuzzy and hard to identify in practice

In order to be effective, efforts on biodiversity conservation can learn from the context-specific local knowledge and institutional mechanisms such as cooperation and collective action; intergenerational transmission of knowledge, skills and strategies; concern for well-being of future generations; reliance on local resources; restraint in resource exploitation; an attitude

of gratitude and respect for nature, management, conservation and sustainable use of biodiversity outside formal protected areas; and transfer of useful species among the households, villages and larger landscape. These are some of the useful attributes of local knowledge systems.

Traditional knowledge on biodiversity conservation in India is diversely scattered in about 3000 communities in their geographical distribution, farming practices, food habits, subsistence strategies, and cultural traditions. Farmers are proved excellent conservators of biodiversity. Small-scale, resource-poor farmers in developing countries breed local crop varieties for improved production using informal innovation systems based on indigenous knowledge. They often employ their own taxonomy, encourage introgression, select, hybridize, field test, record data and name their own varieties.

Field and laboratory studies also suggest that ancient farmers were very efficient in harvesting water. Simple local technology and a principle that preaches "capture rain where it rains" have given rise to 1.5 million traditional village tanks, ponds and earthen embankments that harvest substantial rainwater in 660,000 villages in India alone. Such systems are often integrated with agro-forestry and ethno-forestry practices. Over thousands of years societies have developed diverse local water harvesting and management regimes that still continue to survive in South Asia, Africa and other parts of the world. During the past few decades considerable progress has been made in associating cultural diversity and biodiversity. The International Society of Ethno-biology has played a key role in formulating the inseparable link between cultural and biological diversity. The ***ex situ*** conservation of germplasm has been well-established through the Plant Introduction Stations in the United States, the Consultative Group on International Agricultural Research and the International Board for Plant Genetic Resources. A parallel set of institutions documenting local knowledge about the environment and serving as indigenous knowledge resource centres have been set up and are expected to play a future role in ***in situ*** conservation.

Currently, **Neo-liberalism** has turned land, fauna and flora into **'natural resources'** whereby their principal worth is their exchange value and their right to existence based on what the market is willing to pay for them in monetary terms. This

move to convert nature to a commodity and market its services is a massive transformation of the human -environment relationship and of the political economy of regions and landscapes. But the effects of neo-liberalism on conservation go further than the marketing of conservation, as exemplified by the recent trends of **'commoditization of nature'** and **'payment for environmental services'**. In extreme market logic, a product has the right of existence only if it can muster a clientele, a market. If not, neo-liberal economic theory would predict that the product is bound to disappear or be replaced by a more popular competing product. Transposing this logic to the environmental domain, nature and biodiversity have to be justified by ensuring a demand for their existence. Indeed, many studies have already tried to identify 'environmental services' and their potential clientele.

However, this shift in importance from use to exchange value of nature is much contested. Within the conservation biology network associated with the neo-protectionist resurgence, there are passionate pleas for appreciation of nature for its intrinsic value and not just for what it means to people in market terms. A noteworthy effect of neo-liberal dominance is an increasing acceptance of, or even a 'need' for private sector involvement in biodiversity conservation. This shift follows years of activism against private sector operations and their impact on the environment. It can be argued that this has partly been an image makeover on the part of the private sector. Undoubtedly a lot of profit can be reaped with biodiversity conservation. This is partly due to the development of the international eco-tourism market with tourists seeking virgin areas for leisure and recreation. Moreover, Protected Areas make great conference and business meeting spots. As a result, private sector involvement in biodiversity conservation and protected areas management has exploded in the last decade.

Globalization has literally and mentally created space and time to regard the natural environment in a more holistic way. One specific effect of this has been the assuaging of the importance of the state and international borders in international environmental governance. Consequently, there has been a rise

in popularity of **Bioregionalism**, ecosystem and landscape approaches, global environmental governance and more recently, the establishment of **Trans-frontier Conservation Areas**. All these trends in nature conservation or environmental governance that surpass the nation-state as the ultimate organizational unit and regard international boundaries as 'unnatural' aim at **Integrative Conservation**.

Bioregionalism, though simple in concept, has thus far proven operationally intractable. A key to making bioregionalism work is a close examination of boundaries and what they mean. Most of our political boundaries are completely unrelated to the earth's "**eco-regions**" or "**bio-regions**" — regions defined by their biota. But a close examination of legal boundaries often reveals that though unrelated to biophysical realities, they are nevertheless fixed and powerful.

The importance of increased organizational, managerial and cultural mobility across space and time in relation to natural resource management has also been realized. The activities of external intervening agents can deeply influence the relationship of local communities with the natural resources. The increasing impact that external agents are having on local environments is very apparent. Due to the possibilities offered by the Information and Communication Technology revolution, it has become easier for resource-rich agents to intervene in far-away natural settings; and an increasing number, especially affluent philanthropists, even feel entitled to do so. Yet, while their intervention is with the aim of conservation, they often have great impact on local power dynamics.

Under the trend of bioregional conservation comes the issue of localization, without which globalization cannot be understood. Nature can be interpreted in multiple ways and the global-local dialectic will definitely have a clear impact on conservation issues in the not-too-distant future.

Another significantly identifiable trend in biodiversity conservation is '**hijacked conservation**,' an outcome of the recent international emphasis on security. Paradoxically, this has led to a re-emphasis on borders, making the

implementation of trans-frontier and bioregional conservation approaches strikingly more difficult. International emphasis on security not only includes issues directly related to terrorism and security (such as defence or weapon control) but also associated issues such as economy, health, culture and the environment which become strategic weapons in the war and are conceptually re-structured to fit the security framework and justify increased state control.

The first consequence, the re-tightening of borders following re-assertion of the nation - state pattern, in turn poses new problems and challenges to the development of trans-frontier conservation areas. Another paradoxical effect of the security trend is that conservation and Protected Area management seem to have become more marginalized. Nature has become a strategic pawn in the 'war on terror' and in international security discussions. Besides turning into a commodity, Nature's value has been further regarded for security reasons rather than for conservation purposes.

Although the influence of these global political and economic trends on biodiversity conservation and protected area management is not new, participants in the conservation debate tend to lose sight of this big picture. The pragmatic environmentalist might make his peace with increased environmental protection and awareness under the wider objective of state security. However, for this reasoning to hold, it must be accepted that environmental security, including public safety from environmental dangers and national state security must somehow be reconciled to complement and strengthen each other. This proves problematic as it would involve a shift of resources from state security to environmental protection. A related reason is that environmental threats do not from the face of it, pass as an obvious security issue despite the increased linking of environmental degradation to social and political conflict.

Ancient texts make explicit references as to how forests and other natural resources are to be treated. Sustainability in different forms has been an issue of development of thought down the ages. Though biodiversity conservation has travelled

a long way across various processes and myriad approaches, yet most conservation strategies even now adopt a static view of nature. But then Nature is fundamentally dynamic, as are the pressures of human activities on biodiversity. To realize future conservation objectives it is then truly necessary that new strategies and policies incorporate these dynamics. For sustainable resource conservation and management, it is also essential to adopt the fusion of several different approaches. Future efforts for conservation must be derived from clear objectives, mechanisms for action and commitment from all stakeholders. Apart from this, halting the process of degradation and species loss require definite and specialized solutions along with an understanding and appreciation of ecological processes. In conclusion, the three segments of sustainability - ecology, economy and society are to be addressed based on the supreme principles of **conservation**, **utilization** and **regeneration** to preserve the crucial links in the web of life and nature.

BIBLIOGRAPHY

Arunachalam, V. 2001. The science behind tradition. **Current Science** 80: 1272-1275.

Briers, R. A. 2002. Incorporating connectivity into reserve selection procedures. **Biological Conservation** 103: 77-83.

Mashelkar, R. A. 2001. Intellectual property rights and the Third World. **Current Science** 81: 955-965.

Stern, P.C. 1993. A second environmental science: human-environmental interactions. **Science** 260: 1897-1899.

Tilman, D. 2000. Causes, consequences and ethics of biodiversity. **Nature** 405: 208-211.

Venkataraman, A. 2000. Incorporating traditional coexistence propensities into management of wildlife habitats in India. **Current Science** 79: 1531-1535.

GLOBAL WARMING

Shyamal Kumar Sarkar

One of the most vigorously debated topics on the Earth is the issue of global warming. It is the increase in the average measured temperature of the Earth's near surface air and oceans since the mid 20th century, and its projected continuation, which is synonymous with the term "climate change" in media. Global temperature have increased by 0.75° C(1.35 °F) relative to the period 1860-1900, according to the instrumental temperature record. Increasing global temperature is expected to cause sea level to rise, an increase in the intensity of extreme weather events, and significant changes to the amount and pattern of precipitation, likely including changes in agricultural yields, modifications of traded routes, glacier retreat, mass species extinctions and increases in the ranges of disease vectors.

The National Climatic Data Center contains the instrumental and paleoclimatic records that can precisely define the nature of climatic fluctuations at time scales of a century and linger. Among the diverse kinds of data platforms whose data contribute to NCDS's resources are: Ships, buyos, weather stations, weather balloons, satellites, radar and many climate proxy records such as tree rings and ice cores. The National Oceanographic Data Center contains the subsurface ocean data which reveal the ways that heat is distributed and redistributed over the planet .Knowing how these systems are changing and how they have changed in the past is crucial to understanding how they will change in the future. And, for climate information that extends from hundreds to thousands of years, paleoclimatology data, also available from the National Climatic Data Center, help ,to provide longer term perspectives. Internationally, the Intergovernmental panel on climate change (IPCC), under the auspices of the United Nations (UN), World Metrological Organization (WMO), and the United Nations Environment program (UNEP), is the most senior and authoritative body providing scientific advice to global policy makers. The IPCC met in full session in 1990,

1995, 2001 and in 2007. They address issues such as the buildup of greenhouse gases, evidence, attribution, and prediction of climate change, impacts of climate change, and policy options.

The detailed causes of the recent warming remain an active field of research , but the scientific consensus is that the increase in atmospheric greenhouse gases due to human activity caused most of the warming cannot be satisfactorily explained by natural causes alone. It is also caused by motor vehicles, air conditioner, refrigerator, chemicals used in agricultural field. The greenhouse effect was theorized by Joseph Fourier in 1824 and was first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896 . It is the process by which absorption and emission of infrared (IR) radiation by atmospheric gases warm the planet's lower atmosphere and surface.

The greenhouse effect is unquestionably real and to generate the temperature of our planet. It is caused by increase in atmospheric carbon dioxide (co_2), methane, chlorofluoro carbons (CFC), hydro fluoro carbons(HFC), perfluoro carbons(PFC) , sulpher hexafluoride (SF_6), nitrous oxide (N_2O), Ozone(O_3), Sulpher dioxide(SO_2) gases. These absorb some part of radiation of longer wave length emitted from the Earth's surface, results the increase in temperature of the lower atmosphere.

Due to the enormous complexity of the atmosphere the most useful tools for gauging future changes are "climate models ". There are computer based mathematical models which simulate, in three dimensions, the climate's behavior, its components and their interactions. Projections of future climate change therefore depend on how well the computer climate model simulates the climate and on our understanding of how forcing functions will change in the future. The IPCC Special Report on emission Scenarios determines the range of future possible greenhouse gas concentrations based on considerations such as population growth, economic growth, energy efficiency and a host of other factors. This leads a wide range of possible forcing scenarios, and consequently a wide range of possible future climate. According to the range of possible forcing scenarios, and taking into account uncertainty

in climate model performance, the IPCC projects a best estimate of global temperature increase of 1.8-4.0 C with a possible range of 1.1-6.4°C by 2100, depending on which emissions scenario is used. However, this global average will integrate widely varying regional responses, such as the likelihood that land areas will warm much faster than ocean temperatures, particularly those land areas in northern high latitudes (and mostly in the cold season). Additionally, It is very likely that heat waves and other hot extremes will increase.

মঙ্গল গ্রহের মেঘে বরফের সন্ধানে - লেসার

গোপেন্দ্র নাথ রায়

ভূমিকা ঃ অজানাকে জানাবার এবং অচেনাকে চেনার স্পৃহা মানুষের অনেকদিনের। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ অনেক রহস্যময় জিনিস আবিষ্কার করেও ক্ষান্ত হয়নি। বরং তার জানার ইচ্ছা আরও বেড়েছে। আধুনিক আলোকবিজ্ঞানে এই রকম একটি আবিষ্কার লেসার (LASER)। বর্তমান যুগে রাডার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্পক্ষেত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রতিরক্ষাক্ষেত্র এবং মহাকাল গবেষণা ক্ষেত্রে - বিশেষ করে চন্দ্রপৃষ্ঠ পর্যালোচনায় লেসারের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহের রহস্য উন্মোচন করতে মে ২০০৮ এ পৌঁছে গিয়েছে নাসার ফিনিক্স মার্স ল্যান্ডার। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্য সেখানে জীবনের সন্ধান চালাচ্ছে এই যান। এবার (অক্টোবর ২০০৮) মঙ্গলের মেঘে বরফের সন্ধান দিল নাসার এই অত্যাধুনিক যন্ত্র। ল্যান্ডারের লেসার যন্ত্রে ধরা পড়ল বরফে ভরা মেঘ। ফিনিক্সের অবস্থানস্থলের ২.৫ মাইলের মধ্যেই ছিল বিশেষ এই মেঘ। বিজ্ঞানী হোয়াইটওয়ে জানিয়েছেন, মঙ্গলের মাটিতেও এবার বরফ পড়তে পারে।

লেসার (LASER) কি?

লেসার একটি সাংকেতিক শব্দ। ইংরাজী বাক্য "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" এর শব্দগুলির প্রথম অক্ষর পর পর সাজিয়ে এর উৎপত্তি। একে বাংলা করে বলতে পারা যায় 'বিকিরণের উদ্দীপ্ত নিঃসরণে আলোর বিবর্ধন'। লেসার যন্ত্রের সাহায্যে খুব শক্তিশালী, একমুখী; একবর্ণী এবং সুসংহত (Coherent) আলোকরশ্মি সৃষ্টি করা যায়। সাধারণ আলো আর লেসার রশ্মির পার্থক্য - ভিড়ের মধ্যে চলা মানুষের বিশৃঙ্খল গতি এবং সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজে সমস্ত সেনাদের একতালে পা ফেলে চলার সুশৃঙ্খল গতি।

১৯১৭ খ্রিঃ লেসার তৈরীর সম্ভাবনার কথা প্রথম বলেছিলেন এলবার্ট আইনস্টাইন। উৎপত্তির দিক থেকে এটি মেসার — এর অনুগামী। মেসার (MASER) কথাটি "Microware Amplification by Stimulated Emission of Radiation" কথার আদ্যাক্ষরগুলি নিয়ে

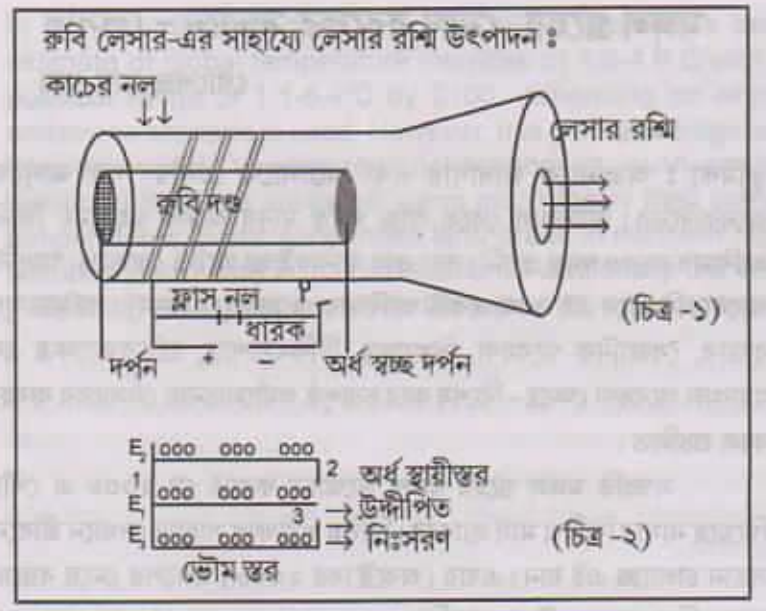

গঠিত। লেসারকে এজন্য আলোকিয় (Optical) ফ্যালো মেসার বলা হয়। ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী টাউন্‌স্ (Townes) এবং স্ক্যালো (Schacolow) এ রশ্মির তত্ত্ব প্রদান করেন। বাস্তবে ১৯৬০ সালে এই চিন্তাকে প্রথম রূপান্তরিত করেন আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইম্যান (Maiman)।

রুবি লেসার হল প্রথম লেসার যা ১৯৬০ সালে গঠন করা হয় (চিত্র - ১)। রুবি মূলত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Ab_2o_3)। লাল রং এর রুবি অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন কেলাস দ্বারা গঠিত - কিন্তু Al পরমানুর ০.০৫ শতাংস ক্রোমিয়াম (Cr) পরমানু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। লেসার ক্রিয়ায় এই ক্রোমিয়াম অংশ গ্রহন করে। পরামানুগুলিকে উদ্দীপিত করার জন্য একটি জেনন ফ্লাস নল ব্যবহার করা হয়। যখন ফ্লাস টিউব একটি সংকট আলোক তীব্রতার উর্দ্ধে ক্রিয়া করে তখন ক্রোমিয়াম পরমানুর ভিতর 'বিপরীত জনসংখ্যা' (Population inversion) তৈরী হয়। পরমানুগুলি প্রথমে E_2 শক্তিস্তরে উদ্দীপিত করা হয় (চিত্র - ২)। ঐ অবস্থায় প্রায় 10^{-3} সেকেণ্ড সময় অবস্থান করে এবং E_1 শক্তিস্তরে সংক্রমিত হয়। এই স্তরে থাকাকালীন উদ্দীপিত নিঃসরণ বিকীর্ণ করতে বাধ্য হয়। এই আলো দুই প্রান্তে বারবার প্রতিফলিত হয়ে এর তীব্রতা বেড়ে যায়। আবার অর্ধস্বচ্ছ দর্পনের মধ্যে প্রতিবার প্রতিফলনের সময় কিছু আলো নির্গত

হয়। এইভাবে রুবি লেসার থেকে লেসার রশ্মি উৎপাদন করা হয়।

উপসংহার :

লেসার যে সুবিধাগুলি মানুষের হাতে এনে দিয়েছে তার মধ্যে রক্তপাত ও বেদনাহীন অস্ত্রোপচার উল্লেখযোগ্য। জীবকোষ ও ক্রোমোজোমের উপর সূক্ষ্ম গবেষনা কার্য্যে লেসার ব্যবহৃত হয়। সুক্ষভাবে ঝালাই (micro - welding) এর কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উড়ন্ত মিসাইল ধ্বংস করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার লেসার সিডি (Compact Disc), ডি ভি ডি (Digital Video Disc) প্রভৃতি বিনোদনমূলক যন্ত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। লেসারের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক ছবি (Holography) সৃষ্টি করা যায়। বর্তমানে বিশ্বকাপ ফুটবলে বা অলিম্পিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হলোগ্রাফির ব্যবহার হচ্ছে। বিজ্ঞানের গতি থেকে নেই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে লেসারের প্রয়োগ আরও বেড়ে যাবে।

GLOBAL WARMING – A Challenge in the 21st Century

Cap and Trade system, Carbon Credits and Carbon Trading

Dipak Kumar Nath

Today one of the biggest threats looming over humanity is the fall out of the 'Global Warming & Climate Change'. There has been strange phenomenon witnessed over the past few years which, scientists have been attributing to the impacts of climate change! According to a recent study report complied by Sir Nicholas Stern, a British Economist, ***"the world has to act now on climate change or face devastating economic consequences".*** In his report he reveals some of these mind boggling statistics, such as:

- *There is a 50 % chance that average global temperatures could rise by five degrees Celsius over the 50 years and it may lead to 10% of global output could be lost in term of economy.*
- *Melting glaciers will increase flood risk and rising sea levels could leave 200 million people permanently displaced*
- *Up to 40% of species could face extinction*

Therefore, it's the need of hour that entire humanity gets united in this cause to make the issue seriously and act urgently. The Governments, International bodies like UN, Civil Society Organizations and individuals need to pull their act together by exploring alternative energy resources and promote environment friendly lifestyle.

CLIMATE CHANGE & CHALLENGES AHEAD

Despite the fact that climate change is one of the biggest threats facing our planet today; negotiations on the issue have been mired in controversy. While the developed nations have contributed most to greenhouse gas emissions, many have been dragging their feet on assuming any responsibility. The US, which is the world's largest emitter of greenhouse gases, continues to hold out.

The science of climate is not a 100 percent accurate and

different models and simulations suggest different scenarios. But there are certain facts that all scientists are unanimous about – the earth is getting warmer and climate systems are changing, and the impact of climate change is something that we are already contending with.

What is also clear is that human activity has been responsible for this. It is unfortunate and, perhaps, unfair that globally the impact of the climate change will disproportionately harm developing nations such as India despite the fact we have contributed relatively little to cumulative greenhouse gas emissions.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Climate change is closely tied to the burning of oil, coal and gas. Fossil carbon is being taken out of the ground, run through combustion chambers, and transferred to more active and rapidly circulating carbon pool in the air, oceans, vegetation and soil. Some of this active carbon builds up in the atmosphere in the form of carbon dioxide, trapping more of sun's heat, warming the earth and destabilizing the climate.

With its huge and growing population, a long, densely populated and low-lying coastline, and an economy that is closely tied to its natural resource base, climate change could have potentially devastating impacts on India. The average temperature change is predicted to rise by 2 to 4 degree C with a doubling in CO2 concentrations.

With climate change, rainfall patterns are also set to change. Western and central areas could have up to 15 more dry days each year, while in contrast, the north and the north-east are predicted to have five to ten more days of rains annually. In other words, dry areas will get drier and the wet areas wetter. Climate change will make India more susceptible to both drought and flooding. IPCC findings indicate that there will be an increase in the frequency of heavy rainfall events in South and Southeast Asia. Studies have also shown that the impact of snow melting in the high Himalayas will lead to flood disasters in Himalayan catchments.

The most dramatic effects of climate change will manifest in agriculture and forestry. These changes in turn could have

profound implications for livelihoods and food security. Agriculture and allied activities continue to be fundamentally dependent on the weather in India. IPCC and other studies suggest that there will be a decrease in yields, though the percentage of decrease varies across different scenarios. Higher temperatures reduce the total duration of a crop cycle by inducing early flowering and the shorter crop cycle, the lower the yield per unit area. Climate change is likely to have substantial impacts on forestry. Climate is an important determinant of the geographical distribution, composition and productivity of the forest. Therefore, changes in climate could alter configuration and productivity of forest ecosystems. Changes in forestry could potentially result in extinction of some species and loss of biodiversity.

The impact of water resources is also expected to be severe, India is considered rich in terms of annual rainfall but these resources are unevenly distributed, causing spatial and temporal shortages across regions. Climate change and variability are likely to worsen the problem of water scarcity that many parts of India face. Under a changed climate regime, the combined effect of lower rainfall and more evaporation would have dire consequences. Both these would lead to less runoff, substantially changing the availability of fresh water in the watersheds. Also, potential changes in temperature and prediction might have a dramatic impact on the soil moisture and aridity level of hydrological zones. With changes in the lows, annual runoff, and groundwater recharge, water is available for usage will further decrease. Most major river basins across the country are likely to become considerably drier. One assessment (Hadley Centre Model Simulations) indicates that by the year 2050, the average annual runoff in the river Brahmaputra will decline by 14%.

Sea level rise associated with climate change threatens India's low lying and densely populated coastline which extends about 7,500 km. UNEP identifies India among the 27 countries that are most vulnerable to sea level rise... Coastal infrastructure, tourist activities, and onshore oil exploration are also at risk. The impact of any increase in the frequency and intensity of extreme events, such as storm surges, could be disproportionately large, not just in heavy developed coastal

areas, but also in low-income rural areas.

Cap and Trade system, Carbon Credits and Carbon Trading across the world opened a new horizon to meet the challenges of global warming – climate change. A few features are discussed in the following paragraphs:

BASICS OF A CAP-AND-TRADE SYSTEM

The primary component of a cap-and-trade program is a limit on the total amount of pollution that a set of sources may emit over a period of time. This allowable amount of pollution is the "cap" in "cap-and-trade". The polluters are allocated shares of the cap. These shares are in the form of a quantity of "allowances" or "tradable permits". In this context, an allowance or permit is the right to emit a certain quantity of pollution over the specified period, of time. Compliance in a cap-and-trade system is relatively simple.

Allowances, which are serialized in an electronic tracking system rather than held as physical certificates, are deducted for every 200 pounds that are emitted. If a source does not have enough allowances to surrender given its emissions, they are assessed a penalty that is usually significantly larger than the market price of allowances. To ensure the environmental integrity of the program, and because allowances are a valuable asset, cap-and-trade programs emphasize stringent emission monitoring and verification procedures.

The "trade" part of the system is that once the allowances are allocated , the sources may buy or sell them. The benefit of allowing polluters to buy and sell allowances is that sources with high pollution control costs can essentially pay sources with low pollution control costs to reduce their pollution. This is achieved by the high cost source buying allowances from the low cost source. If the market for allowances is fluid, sources buy and sell allowances until they each eventually become indifferent to buying one more allowance or abating the amount of pollution an allowance would allow them to emit. When the market reaches this equilibrium, the allowance price reflects the cost of reducing pollution at each source by a small increment.

The regulator does not need to know which sources have

the lowest cost of control; the market for pollution allowances determines which sources will actually reduce their pollution. However, sources collectively reveal their cost of controlling pollution through the allowance price. It may be that the allowance cap is "slack", that there is less demand for emissions than there are allowances. That is, emissions are below the cap because the polluters can emit as much as they would like. In this case the allowance price is zero or close to it. Of course, even if the cap is slack, some sources may still want to buy allowances. But with a slack cap, there are plenty of sources that want to sell allowances. In this case, the exchange price only reflects the cost of the transaction and not the value of the allowances.

Cap –and-trade programs are often more sophisticated in how pollution is treated over space and time than in this simple description. For example, many cap-and-trade programs allow polluters to bank allowances for future use. That is, a source may hold onto an allowance and redeem it to cover emissions in the future.

Further evidence of refinement is in cap –and-trade programs that treat polluters differently based on their locations. For example, allowances used by sources located in areas where their pollution causes more significant damages may be discounted. Alternatively, specific sources may have restrictions on their ability to use allowances to emit above a certain level if there are concerns about local hot spots.

EUROPEAN UNION EMISSIONS TRADING SYSTEM [EU ETS]

The first phase of European Union Emission Trading System [EU ETS] began on 1 January 2005, and it applied to approximately 11,500 installations across the EU 's then 25 member states. The system covers about 45 percent of the EU's total carbon dioxide[CO2] emissions and includes facilities from the electric power sector and other major industrial sectors. The first phase of EU ETS runs from 2005 until 2007 and is sometimes referred to as a "warm-up" phase. The second phase, including all 27 member states, will begin in 2008 and will continue through 2012, coinciding with the five year Kyoto

compliance period.

There has been significant trading activity in the EU market, with nearly €19 billion in transactions in the first three quarters of 2006 alone. However, like other new commodity markets , EU ETS has experienced significant price volatility during its start –up period. Analysts have noted that a number of factors affect allowance price in EU ETS, including the overall size of the allocation, relative fuel prices, weather, and the availability of reduction projects in developing countries.

Several analyses have concluded that the initial allocation in EU ETS represented a very small reduction from business –as-usual emissions. This over allocation for member state targets become clear at the end of the first compliance year in EU ETS, when the allowance market was shocked by the extent to which many member states had allowance surpluses. As individual countries began to report their compliance results, the market price of allowances dropped dramatically. Ultimately, six countries, Austria, Ireland, Spain, the United Kingdom, Italy, and Greece, had annual emissions greater than annual allocations. Two of the largest EU countries, Germany and France, had significant surpluses of allowances.

The EU program has also been criticized for its lack of transparency in target setting that has made it difficult to evaluate the adequacy of targets and the impact of the collective EU ETS target on allowance prices. The decentralized nature of EU ETS process has raised questions about whether member states are using comparable data sources and analytical tools to develop their national allocation plans. Although the European Commission can require member states to reduce their allocations, there has been a lack of consistent information that has allowed the Commission to evaluate the stringency of allocations. The European Commission has tried to address inconsistent and opaque projections of business as usual in its revised guidance for the second phase of national allocation plans.

TO TRADE OR NOT TO TRADE

While cap-and-trade policies can be very effective, they may

not be the tool of choice for all environmental problems. Following are some of the factors that determine whether a cap-and –trade program is appropriate to address a specific problem.

Is flexibility appropriate?

Cap-and-trade programs set an overall target and let the market determine where to make the most cost –effective reductions. But in some cases, it does matter where an emissions reduction is made. For example, if the goal is to control the local impacts of highly toxic emissions, allowing a facility to buy allowances and emit at higher level may not address adequately the risks caused by the facility's emissions. In such a case, it may be necessary to impose source-specific controls and limit the flexibility inherent in an emission –trading program.

Do sources have different control costs?

Cap-and-trade programs make the most sense when emissions sources have different costs for reducing emissions. These cost differences may result from the age of the facilities, availability of technology, location, fuel use, and other factors. If affected sources tend to be relatively homogenous, a cap-and –trade program is not likely to yield a significantly lower cost outcome than more traditional types of regulation where all sources are treated the same. In this case, a traditional regulatory approach may be preferred if a cap-and-trade program is more costly for the regulator to develop and maintain.

Are measurement capabilities sufficiently accurate and consistent?

Unlikely many types of environmental regulation where program administrators judge compliance by adherence to detailed technology or process specifications, cap-and-trade programs require a purely performance –based test for compliance . Ultimately, measured emissions dictate how many allowances a source must surrender at the end of the compliance period. If one source uses a less accurate emissions measurement method than another, it could compromise environmental objectives and undermine market

confidence.

Are there adequate political and market institutions?

There continues to be debate about whether cap-and-trade programs are appropriate for developing countries. No environmental regulation will work effectively if there are not adequate enforcement institutions and respect for the rule of law. However, for the trading component of a cap-and -trade program to work, a country must also have some of the same institutions and incentives in place as those required for any type of market to function. These include a developed system of private contracts and property; companies that make business decisions based on the lower costs and raise profits, and a government culture that allows sources to make decisions without interference.

REGIONAL CLEAN AIR INCENTIVES MARKET [RECLAIM]

RECLAIM consists of two cap-and-trade programs, one for nitrogen oxides [NOx] and one for sulfur dioxide [SO2] and was designed to help bring the Los Angeles basin into compliance with U.S. air quality standards by capping emissions from large facilities. The markets began in 1994, and NOx allocations were reduced by 8 percent and SO2 allocations by 7 percent per year until 2000. At its onset, about 390 facilities were included in one of the two markets, with the vast majority affected solely by the NOx market.

The RECLAIM compliance period is essentially annual, but sources must report their emissions quarterly. Allowances are allocated in two cycles, with some sources receiving allowances valid only from January to December; others' allowances are valid only from July to June.

Allowance allocation was a contentious issue in the RECLAIM program. Affected sources were allowed to choose a baseline level of emissions from any year between 1989 and 1992. When the allocations were being made, it was recognized that this was a period of high economic activity and that it appeared that the economy would be in a depressed state [and indeed was] in the early years of the program. Given

the difficulty associated with special rules that discouraged allowances banking and the reduced economic activity, there was little impetus for affected sources to reduce their emissions, and many allowances went unused.

Eventually, as allocations continued to fall, it was expected that the RECLAIM caps would become binding and the allowance prices would reflect more than just the transaction cost of their exchange. The NOx RECLAIM market experienced considerable price volatility as the price of a NOx credit rose from $1 to $30 per pound in 2000. A NOx allowance price increase was expected as the cap in 2000 was near the level of NOx emissions in the immediately proceeding years [total emissions in 1998 and 1999]. However, the dramatic increase in the NOx allowance price was not caused by the allocations reduction. Rather, it was caused by an increase in the operation of electricity generators affected by the program. These generators ran at much higher capacity than in previous years owing to California's flawed electricity market deregulation. A year later with the electricity market still in disarray, NOx credits were being exchanged at more than $60 per pound, and sources were no longer holding enough allowances to cover their emissions. The regulatory body administering RECLAIM removed the electricity generators from the program in May 2001.

Once removed from the market, the electricity generators were required to install NOx pollution control technologies. In addition, all sources emitting more than 50 tons of NOx were required to submit binding compliance plans that describe how they will comply with RECLAIM until 2006. The electricity generators were recently brought back into the program.

REGULATING POLLUTION, CAP-AND-TRADE SYSTEM, MANY DEALS, LITTLE TIME

THE CAPACITY OF THE AIR, WATER, AND LAND to absorb the growing human stresses being placed on them is diminishing, and countries acting alone will not be able to

reverse or shield themselves from these threats. Change is coming – to the Earth's life-supporting ecosystems and to the way we treat them. The urgent questions is whether the North and the south will invest in less costly preventive action now or leave a much higher tab and more degraded environment for future generations.

The world faces two enormous tasks: first, domestic and international development planning must be reoriented so that environmental considerations receive much higher priority; and second, new mechanisms must be established to stabilize and reverse those environmental risks that potentially endanger the entire globe and require coordinated multilateral action. Although this study focused on the latter task, these challenges are for all practical purposes inseparable.

Global environmental security will depend as much on actions taken in the South as on those taken in the North. North –South bargains on climate –control, species protection, and forest management will be unavoidable. A common cause of all three of these interrelated global problems is rapidly expanding populations. As politically difficult as it will be for both North and South, the imperative of stabilizing population growth as rapidly as possible.

Development strategies are now available that are less costly and better for the environment than conventional approaches. Least –cost energy planning and natural resource accounting are promising tools that help planners weigh the merits of alternative approaches. Where start-up costs may be higher for pollution-control technologies or for measures to prevent soil erosion, these investments can be balanced against the long-term economic savings from improved environmental quality. At the macroeconomic level, these alternative approaches also reinforce needed reforms of policies that profoundly distort the way natural resources are used and distributed among income groups.

There are no quick fixes for the root causes of environmental deterioration in the South. International accords or strategies that are narrowly focused on environmental objectives are doomed to fail. Of special

concern, population growth, rising poverty, and environmental deterioration are tightly linked, and complex interventions will be needed that address all three problems but are tailored to local social, economic, and environmental conditions.

The World Bank needs to play a central role in global environmental management. Beyond its administration of the GEF, however, World Bank operations will have to change greatly to take on this new role: all its lending and technical expertise must be reoriented and give high priority to environmental objectives, and borrowers and other affected outside interests require more access to its decision making.

International trade and financial regimes need to reflect a concern for environmental objectives. Equitable, efficient, and environmentally sound development strategies cannot compete with the developing countries' natural resource dependence, debt-service obligations, and declining terms of trade. Yet environmental diplomacy is largely severed from the principal international bodies—most notably GATT and the IMF — that regulate the overwhelming share of flows of capital, goods, and services among countries. Donors have used their macroeconomic leverage mainly by trying environmental "conditions" to aid, loans, or trade. These "strings" can give donors some means for accountability, but they are only one small and not always terribly effective vehicle for strengthening resource management in the South. Instead, the industrial countries can and should take the vastly more productive steps of opening trade, relieving debt, and expanding their aid programs.

Environmental diplomacy needs to emphasize the considerable global benefits from greater North – South environmental cooperation. The developing nations want a greater share of the world's financial resources as well as what remains of the Earth's "environmental space" so that they can raise the living standards of their growing populations. But their solidarity in the negotiations has been mainly "limited to warding off the Northern agenda".

The developing countries face many obstacles to more effective participation in the UNCED environmental diplomacy. For both substantive and logistical reasons, the Group of 77 has generally not been able to provide a forceful, unified voice

on behalf of developing –country interests. Nonetheless, the overall environmental diplomacy has been hindered by the developing nations' genuine concerns of national sovereignty over forest and species resources.

The very nature of the environmental threats, however, means that developing countries **must** receive enhanced cooperation and resource flows—and both North and South will benefit. There are many more appropriate alternatives for donors to support that are more cost-effective and better for the environment than current policies and practices.

The real test for the future lies in the *commitment of both developing and industrial* countries to put their scarce leaders, institutions, and resources behind the tremendous challenges of achieving sustainable development. On an international level the realities of global environmental interdependence require multilateral solutions—with all nations ceding some degree of economic and political control.

Library Science

on behalf of developing-country interests. Nonetheless, the tide of North-South dependency has been reinforced by the increasing pressures [illegible] of [illegible] supply from forests and [illegible] industries.

The very nature of the environmental [illegible], however, means that developing countries must [illegible] cooperation [illegible] with resource bases—and both North and South will [illegible]. There are many [illegible] alternatives [illegible] to suggest that [illegible] will better [illegible] than current policies and practices.

The real test [illegible] lies in the commitment of both developing and developed countries to [illegible] their [illegible] institutions, and resources toward the [illegible] challenges of achieving sustainable development. On an [illegible] level, the [illegible] of global environmental [illegible]—with or [illegible] economic and political [illegible].

Open Library : a brief discussion in Indian context

MS. Sarama Das

Abstract :

We want to draw some idea of Open Library by means of its resources and services in Indian perspectives. Now we have entered into digital era. Information Technology is the only solution to reach all types of information , which are generating rapidly to the effective people at the least time. Though there so many constrain, but few of them can be overcome through consortium approach. Like UGC Infonet Digital Library Consortium Programme, all Indian universities are working under one umbrella with help of UGC and INFLIBNET Center.

Key words: E-resources, ICT, Internet, UGC Infonet, Open library, Library automation

Introduction:

Library is a social organization. In traditional library all resources are used to kept in a particular place and these are access by the limited number of user according to their needs. These types of library have some limitations i.e. space, fund, staff and time. But with the advent of IT and Networking has broken the barriers of traditional library services and made it possible for common people to access global information at a time. With the help of Communication Technology more than one patron can retrieve the information simultaneously at a very short time. So in 21st century library is not restricted in to its limited no. of resources, as well as it services, it has become open to all common people even to remote area.

Meaning :

Open Library can be define as, where library resources as well as its services can be access by unlimited no. of clients at a time from anywhere at the least time. We may say a concept of Library without boundary/wall.

Reasons for Open Library :

At early age in traditional library the closed access library system was there In that case there are some constrains to

use the information according to need. Then it has been realized that information should be optimized, there will be no obstacle. So open access library system has come.

In spite of open access library system, there is sill some obstacle to access all types of information. Due to information explosion it is not possible for a single institution to acquire all types of information on a particular subject field. There are problems of space, time, fund and staffs. Where there is a problem, there have some solutions also. Through resource sharing the above mentioned problems can be solved partly, but time is a major factor. Modern era is going very speedy. At every seconds by R&D activities new information are generating rapidly. So people want to access their required information with in a fraction of second, unless information will be getting backdated.

That's why the Open Library concept has come. Now it is not restricted to a particular institution. User can learn through internet in the form of E-resources.

Diagrammatic representation of Open Library Model:

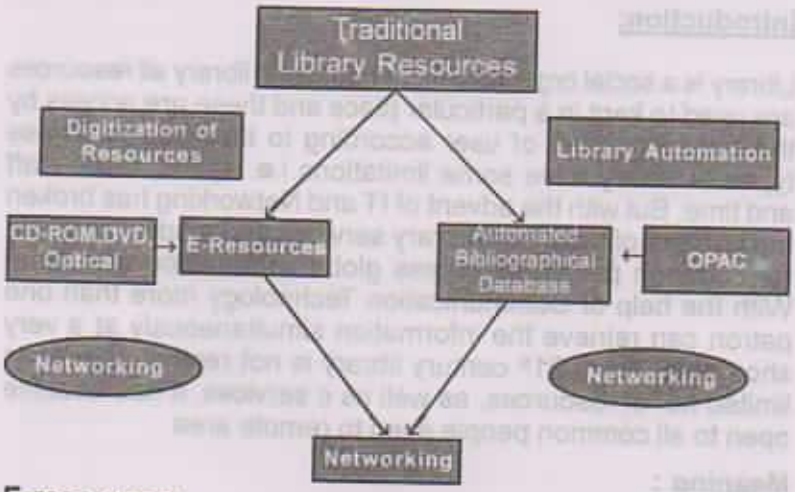

E-resources:

In developing country like India there is no single library which we can say Digital Library, they are all hybrid library. That means it is a unification of traditional and E-resources. E-resources are two types – some are born digital and some are converted to digitized form. Nowadays in India some institutions have taken initiative to digitize their library

collections by scanning or by using digital camera especially for manuscript.

Library automation:

One can know about the collection of resources of a particular library through its bibliographical databases. So, when it is in hard copy it is restricted to the limited no. of client, but when it is in OPAC form it can be retrieve from any place of the country at the remote to remotest area. So until unless library is automated it can not be possible to become open to all.
There are so many library software, such as SOUL(developed by INFLIBNET), WINISIS, SANJAY (developed by NISSAT), LIPSYS to automation of the library collections as well as housekeeping works. Open source software are also available (Greenstone, D.Space etc.)

Indian perspectives:

In India the higher education system is standing mainly on Universities. There are approximately 171 universities in India, their libraries are also rich in resources. They have taken initiative to reach their resources to the information seeker as well as learned society at any place through Information Communication Technology. UGC has the main key role to connect all Indian universities as well as its affiliated Colleges and to access all e-resources which are published rapidly all over the world. UGC Infonet Digital Library Consortium programme has been implemented after connecting all Indian Universities through internet in the year 2003 by our honorable former Indian President Dr. A.P.J. Kalam.
The rising cost of all scholarly journals and the paucity of funds available to the libraries have solved by UGC Infonet Digital Library Consortium Programme. The consortium provides current as well as archival access of more than 4500 peer reviewed journals, 9 bibliographical databases from 23 publishers in different subject fields. At present out of 171 , 152 universities have benefited by this UGC Infonet Digital Library Consortium Programme. This programme is totally funded by UGC and executed by INFLIBNET Centre Ahmedabad. In near future they have plane to extended this programme to Potential with Excellence Colleges and other membership private universities.

The UGC Infonet Digital Library Consortium subscribes a number of e-resources for its member institutions. Some of them are mentioned below:

Sl.No.	Name of Publisher	Type	Site address
1.	American Chemical Society	Full text	E-resources http;/ pubs.acs.org/
2.	Blackwell Publishing		http://www. web3.interscience. wiley.com/
3.	Cambridge University Press		http://journals. cambridge.org/
4.	Elsevier Science		http://www. sciencedirect. com/
5.	Emerald		http://www. emeraldinsight. com/
6.	Nature		http://www. nature. com/
7.	Oxford University Press		http:// oxfordjournals. org/
8.	SciFinder Scholar	Bibliographical Data base	http://wwwcas.org /SCIFINDER/ SCHOLAR/ index.html/
9.	JCCC		http://jccc-uqcinfonet.in
10.	Open Access e-journals	Open Access Resources	http://www. oaeresources. html#ejournals
11.	Open Access e-directories		http://www. oaeresources. html#directories

(Source: http://www.inflibnet.ac.in/econ/eresource.html#)

Challenges:

- Ø Rapid publications of E-resources
- Ø Rising cost of journals much faster than the rate of inflation
- Ø Fixed of declining library budget
- Ø Regularity of publications
- Ø Archiving and preserving
- Ø Evaluation
- Ø Linguistic issues.

Conclusion:

Hence coming to the conclusion we can say , though 21st century is fully depends upon IT and we have to adopt the Information Communication Technology to cope with the explosion of information in different subject field, the concept of widening and opening of knowledge and resources to the common people is not a new concept in Indian context , rather it has been advocated by different Indian philosopher starting from Vedic period to modern period. Rabindranath Tagore had mentioned in his poem no.35 in "Gitanjali"

"Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragment
By narrow domestic walls"

Swami Vivekananda had told "Carry the education to common people".

Bibliographical References:

1. Inflibnet directory-2008 .(http://www.inflibnet.ac.in/)
2. http://www.inflibnet.ac.in/econ/about.html# (site visited on 08/09/08)
3. http://www.inflibnet.ac.in/econ/eresource.html# (site visited on 08/09/08)

4. Schware (Robert). Information and communication technology agencies: function, structures and best operational practices, http://www.emeraldinsight.com/1463-6697.htm (site visited 07/01/08)

5. Thakur (Rabindranath). Gitanjali.Biswabharati Publication, Santiniketan.pp.35

Traditional Library Resources
CD-ROM, DVD, Optical Disk

OPAC

E-Resources

Automated
Bibliographical
Database

Library Automation

Digitization of Resources

Patron

Networking

Networking